অনুচ্ছেদ ঃ যে-কোনো রচনা পাঠোপযোগী করে তৈরি করার সময় যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার তার মধ্যে অন্যতম হল অনুচ্ছেদ। ইংরেজিতে বলে প্যারাগ্রাফ। অনুচ্ছেদ মূলত দুটি উদ্দেশ্যসাধন করে। একটি রচনার কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করে। অপরটি রচনার বিষয়গত ভাবনাকে সুসংহত করে প্রকাশ করে। কোন রচনায় যদি অনুচ্ছেদের পরিবর্তে লাইনের পর লাইন বিন্যস্ত হয়, তাহলে একই মাপের অক্ষরের ব্যবহার এক ধরনের ধূসরতা নিয়ে আসবে। পাঠকের চোখের পক্ষে তা যথেষ্ট পীড়াদায়ক। পাঠে বৈচিত্র আনতে সাদা অংশের ব্যবহার খুবই কার্যকরী। অনুচ্ছেদ দিলেই সামান্য যে সাদা জায়গা পাওয়া যায় তা চোখের পক্ষে আরামদায়ক। দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যবর্তী জায়গা অঙ্গসজ্জায় নিয়ে আসে বৈচিত্র। একটি অনুচ্ছেদ পড়ার পর পাঠক সামান্য বিরতি পায়, ঘনবন্ধ ধূসরতা থেকে পায় মুক্তি। একটি রচনার কাঠামোকে এভাবেই সুবিন্যস্ত করা যায় অনুচ্ছেদের ব্যবহারের মাধ্যমে। সম্পাদনার সময় যদি খুব বড় অনুচ্ছেদ এসে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ভেঙে দুতিনটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে নেওয়া উচিত।

বিষয়গত দিক থেকে নতুন অনুচ্ছেদ মানেই হল নতুন কোন যুক্তি ও ভাব। ধারাবাহিকতার মধ্যেও এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য। যে কোন বিষয়ের উপস্থাপনকে যা মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলে। বিষয়টি উপলব্ধি করতেও পাঠকের সুবিধা হয়।

সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা অবর-সম্পাদককে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যাতে সকল অনুচ্ছেদ একই মাপের না হয়। ছোট বড় মাঝারি মিশিয়ে নেওয়াই ভাল। এতে বৈচিত্র্য আসে, একঘেঁয়েমি আসার সম্ভাবনা কম থাকে। সব অনুচ্ছেদ যদি একই মাপের হয় তাহলে অঙ্গসজ্জা হয়ে উঠবে যান্ত্রিক, পাঠের পক্ষে তা সুখের হবে না। সংবাদ লেখা হয় উল্টো পিরামিড আঙ্গিকে। অনুচ্ছেদ পেরিয়ে যত এগোন যায় তত কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান মেলে। একেবারে শেষের দিকে এমন তথ্য থাকে যা না জানলেও সংবাদের মূল বিষয়বস্তু বুঝতে পাঠকের কোন অসুবিধা হয় না। অঙ্গসজ্জার সময় যদি প্রয়োজন হয় অনেক সময় রচনাকে ছোট করতে হয়। সেই সময় তলা থেকে একটি দুটি অনুচ্ছেদ প্রয়োজন মতো কেটে বাদ দিলেই কাজ মিটে যায়। কারিগরী কৌশলের দিক থেকে অনুচ্ছেদ ব্যবহারের উপযোগিতা এখানে রয়েছে। অনুচ্ছেদ গঠনের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

> রিভলভার ঠেকিয়ে এবার পুলিসেরই মোটরসাইকেল ছিনতাই করল দুস্কৃতীরা। রবিবার সন্ধ্যায় জনবহুল যশোহর রোডের ওপরে এই ঘটনাটি ঘটলেও সোমবার রাত পর্যন্ত পুলিস এই ব্যাপারে কোনও কিনারা করতে পারেনি। দমদম থানার ম্যাগাজিন আবাসনের কাছে যশোহর রোডের উপরে ছিনতাইয়ের এই ঘটনা ঘটে। ওই পুলিসকর্মী সাদা পোষাকে ছিলেন। যে ভাবে

তাঁর বাইকটি ছিনতাই করা হয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ লেক টাউন থানার সাদা পোশাকের পুলিস বাহিনীর (পিসিপার্টি) কনস্টেবল অরুণ সরকার ডিউটি সেরে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর বাড়ি গোরাবাজার এলাকায়। পুলিস জানায়, তিনি গত সাত আট বছর দমদম ফাঁড়িতে ছিলেন। এক পুলিস কর্তা বলেন, অরুণবাবু পুলিসকে জানিয়েছেন, মাঝপথে ম্যাগাজিন আবাসনের সামনে তাঁর মোটর সাইকেলের সামনে একটি লরি চলে এলে তিনি গতি আস্তে করে দেন। ততক্ষণে একটি অটোরিকশা তাঁকে পেরিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। নিমেষে অটোরিকশা থেকে দু'জন যুবক নেমে আসে ও অরুণবাবু কিছু বুঝবার আগেই তাঁর কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে দেয়। প্রাণভয়ে অরুণবাবু মোটর সাইকেল থেকে নেমে আসেন। দুস্কৃতীরা এর পরে অটোরিকশা ছেড়ে ওই মোটর সাইকেল নিয়ে চম্পট দেয়। তাঁর মোবাইল ফোনটিও ছিনিয়ে নেয় তারা। এই খবর জানাজানি হওয়ার পরেই দমদম ও লেকটাউন থানার অফিসারেরা ঘটনাস্থলে যান। এখনও দুস্কৃতীদের হদিশ মেলেনি।

সংবাদটি সম্পাদনার সময় যদি ক'টি অনুচ্ছেদে ভাগ হয়ে পরিবেশিত হয় তাহলে পাঠকের পড়তে ও বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। নিচে করে দেখানো হল ঃ

[রিভলবার ঠেকিয়ে..
....
....কিনারা করতে পারেনি।

[দমদম থানার ম্যাগাজিনে আবাসনের ....
....
....
....
.... প্রশ্ন উঠেছে।

[রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা..
....
....

....

.... গোরাবাজার এলাকায়।

পুলিশ জানায় ....

....

....

....

.... হদিস মেলেনি।

১১৭.১০ সারাংশ

সম্পাদনায় চিহ্নের ব্যবহার হয়। সাংকেতিক চিহ্নগুলি সম্পাদক দেন তাঁর নির্দেশ কম্পোজিটারকে বোঝাতে। যেমন অনুচ্ছেদ দেবার জন্য [এই চিহ্নটি দিলেই কম্পোজিটর অনুচ্ছেদ দিয়ে দেবেন। বিভিন্ন চিহ্ন রয়েছে, প্রয়োজন মতো এগুলি অবর-সম্পাদকেরা কপির ওপর প্রয়োগ করে সম্পাদনা করেন।

অনুচ্ছেদ যে কোন রচনার বিন্যাসকে সুসংহত করে তোলে। অনুচ্ছেদের প্রয়োগ দুটি দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক, বিষয়-ভাবনাকে সুন্দরভাবে মেলে ধরবার জন্য। পরতে পরতে যেমন ফুল প্রস্ফুটিত হয় তেমনি বহু অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ফুটে উঠবে সামগ্রিক বিষয়-ভাবনা। দুই হল পৃষ্ঠাসজ্জাকে নান্দনিক এবং কারিগরী উপযোগিতার দিক থেকে সার্থক করে তোলা। বৈচিত্র্য আনার জন্য অনুচ্ছেদের মাপও বিভিন্ন রকম করা হয়।

১১৭.১১ অনুশীলনী—৩

১) সম্পাদনা চিহ্নের উপযোগীতা কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২) অনুচ্ছেদ কীভাবে সংবাদ পরিবেশনকে সার্থক করে তোলে? অনুচ্ছেদের আয়তন সমান হওয়া কী বাঞ্ছনীয়? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

১১৭.১২ মূলপাঠ—৪ ঃ টাইপসজ্জা ও মার্জিন, শিরোনাম, উপশিরোনাম

টাইপসজ্জা ঃ ছাপা লেখা তৈরি হয় টাইপ দিয়ে। বিভিন্ন মাপের এবং ধরনের টাইপ ব্যবহার করে মুদ্রণকে অভিনব ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়। ছাপতে গেলেও সাজাতে হয়। যা ছাপা হবে

তা যাতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার জন্য পরিকল্পিত প্রয়াসের প্রয়োজন। এই প্রয়াসের অন্যতম অঙ্গ হল টাইপসজ্জা। কোন রচনায় কী টাইপ ব্যবহার হবে, তার সাইজ ও ধরন কেমন হবে তা নির্ধারণ করেই টাইপ সজ্জার রূপরেখা তৈরি করা হয়।

একজন দক্ষ অবর-সম্পাদককে টাইপসজ্জা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। শিরোনাম ও সংবাদ একই মাপের অক্ষরে হয় না। শিরোনামের মাপ হয় অনেক বড়। সংবাদের অক্ষর হয় অনেক ছোট। আবার অনেকসময় সংবাদের সূচনা তৈরি হয় বোল্ড ফেসে। অক্ষরগুলো বেশ ঘন কালো থাকে। কোথায় কী হবে সেটা নির্দেশ করে দেওয়া দরকার। সম্পাদনার সময় অবর-সম্পাদকই এগুলো ঠিক করেন। প্রয়োজন হলে প্রেসে গিয়ে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে হয়।

ইংরেজিতে টাইপ ফেস দুরকম—সেরিফ ও সান্স। সেরিফ একটু সূক্ষ্ম রেখা বিশিষ্ট, সান্সে কোন সূক্ষ্মতা নেই। ‘সান্স’ টাইপ একটু মোটা, ভোঁতা ধরনের। ‘স্টেটসম্যানে’র টাইপ ‘সেরিফ’, নাম সেঞ্চুরি। ‘হিন্দু’র টাইপ ‘সান্স’, নাম হেলভেটিকা।

টাইপের মাপকে পয়েন্ট বলে। সাধারণত ১ ইঞ্চির ১/৭২ অংশ হল ১ পয়েন্ট। এই মাপ অনুসারে টাইপ ৫১/২, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৬০, ৭২ পয়েন্ট পর্যন্ত হতে পারে। ৭২ পয়েন্ট হল ১ ইঞ্চি। এর চেয়ে বড় হরফের দরকার পড়লে ক্যামেরার সাহায্যে বড় করে নেওয়া যায়।

টাইপের আয়তনও গুরুত্বপূর্ণ। সব টাইপের আয়তন একই রকম হয় না। আয়তনের হিসেব হল ১ ইউনিট। AB হল ১ ইউনিট। বাংলায় ক, খ হল ১ ইউনিট। MW ঝঞ হল ১১/২ ইউনিট। ইংরেজি I, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি হল ১/২ ইউনিট।

টাইপের তিনটি পরিবার আছে। এগুলি হল আদল (face), শ্রেণি (font) এবং পরিবার (family)। আদল হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নক্‌সা। শ্রেণি হচ্ছে অক্ষরের একটি বিশেষ ধরনের নক্‌সার সামগ্রিক রূপ। আর পরিবার হল একই শ্রেণির বিচিত্র অক্ষরের সমষ্টি। যেমন হাল্কা (light), ছড়ানো (expanded) মধ্যম (medium), স্থূল (bold), ঘনসন্নিবিষ্ট (condensed), বাঁকা (italic) ইত্যাদি বিচিত্র রকমের টাইপ হতে পারে।

টাইপের প্রস্থ মাপা হয় পয়েন্ট দিয়ে। তবে বলার সময় বলা হয় ‘এম’। একটি ইংরেজি ‘এম’ অক্ষর বারো পয়েন্টের। এর অপর নাম হল ‘পাইকা এম’। ‘এম’ দেখতে চৌকো। তাই এর মাপ হল ১২ × ১২ = ১৪৪ বর্গ বিন্দু। অক্ষর দিয়ে লেখা সাজানোর সময় এইসব হিসেব বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। একটি রচনাকে দৃষ্টিনন্দন করে উপস্থাপনার ব্যাপারে টাইপ সজ্জার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্জিন ঃ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে কোন মুদ্রিত রচনার দুই প্রান্তে সাদা অংশ থাকে। এই সাদা অংশকেই বলে মার্জিন। কম্পোজ করার সময় উভয় দিকের মার্জিন সমান রাখা হয়। মার্জিনের সাদা অংশ পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। পাঠক তর তর করে পড়ে যেতে পারে। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে অনেক সহজে এগোন যায়। খবরের কাগজে সাধারণত কলামের মধ্যে সমান মাপের লাইন সাজানো থাকে। মার্জিন থেকে মার্জিন মেপে লাইনের মাপ করতে হয়। কলামেরও একটি নির্দিষ্ট মাপ থাকে। কলামের দুদিকে সামান্য সাদা অংশের মার্জিন রেখে লাইনগুলি বসাতে হয়। কলামের প্রস্থ যদি ১২ এম হয় তাহলে লাইনের মাপ হবে ১১½ এম। হাফ এম জায়গা বন্টিত হবে দুদিকে। যে কোন রচনার পাঠযোগ্যতা বাড়াতে ও উপস্থাপনাকে দৃষ্টিনন্দন করতে মার্জিনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কম্পোজ হবার পর অবর-সম্পাদককে এই মার্জিনের ব্যবহার যথাযথ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হয়।

শিরোনাম ঃ সংবাদ পরিবেশনে শিরোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদের নির্যাসটুকু ধরা থাকে শিরোনামে। পাঠক কাগজে চোখ রেখে প্রথমেই দেখেন শিরোনাম। যাঁর পুরো সংবাদ পড়ার সময় নেই তিনি শিরোনাম দেখেই জানতে পারেন দিনের খবর কী। শিরোনামের মধ্যেই সংবাদের মূল বিষয়টি ধরা থাকে। দেখলেই বোঝা যায় কী ঘটেছে।

সংবাদপত্র প্রকাশনার প্রথম যুগে শিরোনামের ব্যবহার ছিল না। সে সময় কাগজে পরপর সাজানো থাকত কিছু লেখা। সংবাদের ওপরে থাকত কেবলমাত্র লেবেল। ওষুধের শিশির পরিচিতির মতো। লেবেল দেখে আভাষ পাওয়া যেত সংবাদ কাহিনীর বিষয়বস্তুর। এ ছাড়া একটা লেখার সঙ্গে আরেকটি লেখার কোন পার্থক্যও করা যেত না। পর পর সংবাদ পড়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না পাঠকের কাছে।

শিরোনামের চল শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। গৃহযুদ্ধের খবরকে, মেক্সিকো যুদ্ধের সংবাদকে তাড়াতাড়ি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য শিরোনাম ব্যবহৃত হতে থাকে সংবাদপত্রে। এরপর আসে হলুদ সাংবাদিকতার যুগ। হলুদ সাংবাদিকতা বলতে বোঝায় চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতা। নাটকীয়ভাবে, চমকসৃষ্টি করে সংবাদ পরিবেশন করা শুরু হয় এই সময়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বড় শিরোনামের প্রচলন হয় দ্রুত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শিরোনামকে আরও জনপ্রিয় করে এবং শিরোনাম প্রতিদিনের সাংবাদিকতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে শিরোনামই সংবাদপত্রের প্রাথমিক পরিচয়। পাঠক কাগজ হাতে নিয়ে প্রথমেই চোখ বোলান শিরোনামে, যা নাটকীয়ভাবে চমক দিয়ে ঘোষণা করে দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী শিরোনাম তৈরি হয়। প্রথম পাতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের শিরোনাম সবচেয়ে বড় আকারে থাকে। আট, সাত অথবা ছ-কলাম জায়গা নিয়ে খুব বড় হরফে ছাপা হয় দিনের সবচেয়ে বড় খবর। তারপর সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী শিরোনামের আয়তন ছোট হতে থাকে। বিভিন্ন মাপের শিরোনাম পাঠককে বলে দেয় কোন্‌টি আগে পড়তে হবে। কেবলমাত্র শিরোনামে চোখ বুলিয়েই পাঠক বেছে নিতে পারেন তাঁর পছন্দের সংবাদটি। শিরোনামের এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে বলে সূচি (indexing) তৈরি করে দেওয়ার কাজ। সংবাদ পাঠে শিরোনাম পাঠকের সহায়ক হয়ে ওঠে।

একটা পাতায় অনেকগুলি সংবাদ থাকে। প্রতিটি সংবাদের থাকে একটি করে শিরোনাম যা বিভিন্ন সংবাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে। খুব সহজে পাঠক একটি সংবাদকে আলাদাভাবে চিনতে পারে। এই স্বাতন্ত্রের মাধ্যমে পৃষ্ঠা সজ্জায় আসে বৈচিত্র। অঙ্গসজ্জাকে মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলে। সব শিরোনামের চেহারা একরকম হয় না। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম একটি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত হতে পারে। কী ধরনের শিরোনামে ব্যবহার হবে তা নির্ধারিত হবে সম্পাদনার সময়।

বিভিন্ন রকমের শিরোনাম ঃ শিরোনামের একটি জনপ্রিয় রূপ হল বাম স্পর্শক (Flush left)। সাধারণত দুই বা তিন লাইনের মধ্যে এই শিরোনাম তৈরি হয়। প্রতিটি লাইন বাঁ দিকের স্তম্ভরেখা থেকে শুরু হয়ে ডান দিকে যে-কোনো জায়গায় শেষ হয়। তবে অবশ্যই কলামের নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে। বিন্যাসের জোর থাকে বাঁদিকে।

আর একটি শিরোনাম হল দক্ষিণ বাম স্পর্শক (Flush right and left)। এই শিরোনাম দুই তিন বা চার লাইন বিশিষ্ট হয়। দু দিকের স্তম্ভ রেখার পাশে সমান সাদা জায়গা ছেড়ে লাইনগুলি সাজানো হয়। সমান সাদা জায়গা একটি ভারসাম্য নিয়ে আসে এবং দৃষ্টি আবদ্ধ করে মাঝখানের উপস্থাপিত লাইনে।

বহুল প্রচলিত একটি শিরোনাম হল উল্টো পিরামিড। সাধারণত দুই, তিন, লাইন দিয়ে তৈরি হয়। প্রথম লাইনটি এক দিকের স্তম্ভ রেখা থেকে বিপরীত দিকের স্তম্ভ রেখা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পরের লাইনগুলো প্রস্থে ছোট হতে থাকে। নীচের দিকটা ক্রমশ ছুঁচলো হওয়ার ফলে উল্টো পিরামিডের আকৃতি নেয়।

শিরোনামের আর একটি রূপ হল ওয়েস্ট লাইন। তিনটি লাইন অবশ্যই এখানে থাকবে। প্রথম

ও তৃতীয় লাইনটি সমান আকারের হবে। দ্বিতীয় লাইনটি ছোট হবে এবং বাঁ দিকে, ডানদিকে সমান ফাঁক রেখে মধ্যিখানে বসবে। কোমরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে এর নাম ওয়েস্ট লাইন।

অন্য একটি শিরোনাম হল স্ট্র্যাপ লাইন। মূল শিরোনামের ওপরে ফিতের মতো একটি লাইন রাখা হয়। লাইনটি বাঁদিক, ডানদিক অথবা মাঝখানে বসতে পারে। এর অপর নাম ওভারলাইন অথবা শোল্ডার। ওপরের লাইনটির মাপ মূল শিরোনামের চেয়ে ছোট হবে। মূল শিরোনামের মাপ যদি হয় ৪৮ পয়েন্ট, তাহলে স্ট্র্যাপ লাইনের মাপ হবে ২৪ পয়েন্ট।

ক্রশ লাইন হল শিরোনামের আর একটি রূপ। একটিমাত্র লাইন নিয়ে গঠিত হয়। কলামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সাধারণত তিন, চার কলাম জায়গা নিয়ে বিন্যস্ত হয়। কলামের দুদিকে সামান্য ফাঁক থাকে।

অনেক সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের জন্য আট কলাম জুড়ে শিরোনাম তৈরি হয়। একে বলে ব্যানার শিরোনাম। বড় খবর হলে সারা পাতা জুড়ে এমন শিরোনাম তৈরি করা হয়।

শিরোনাম রচনা ঃ শিরোনাম লেখা হয় সম্পাদনার সময়। জায়গা বুঝে অবর-সম্পাদক সংবাদের মূল বিষয়টি আশ্রয় করে শিরোনাম রচনা করবেন। রিপোর্টার অথবা প্রতিবেদক সংবাদ প্রতিবেদন লেখেন, কিন্তু ঐ প্রতিবেদনের শিরোনাম দেন অবর-সম্পাদক। অবর সম্পাদক সংবাদ প্রতিবেদনটি ঘষামাজা করে ছাপার উপযুক্ত করে যখন গড়ে তোলেন, তখনই জুড়ে দেন একটি উপযুক্ত শিরোনাম।

শিরোনাম রচনায় শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত দক্ষতা ও বিবেচনার সঙ্গে করা দরকার। অল্পকথায় সঠিক শব্দচয়ন শিরোনামকে সার্থক করে তোলে। এমন শব্দ নির্বাচন করতে হবে যা সংবাদের বিষয়কে যথাযথভাবে তার রূপ ও ভাব বজায় রেখে প্রকাশ করতে পারে। ঠিক যা ঘটেছে তা ঘটনার মেজাজটুকুসহ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সহজ ছোট শব্দ দিয়ে কাজ সারতে হবে। সোজাসুজি বিষয়টি পৌঁছে দেওয়া দরকার পাঠককে। উপমা, রূপক, অলংকারের ব্যবহার একেবারেই চলবে না। তাহলে কথার ভারে আসল বক্তব্য গুলিয়ে যাবে। একটি ঘটনার মধ্যে থাকে নাটকীয়তা, অভিনবত্ব ও চমক। শিরোনামে এই মেজাজটা ধরে রাখা দরকার।

খবর হল প্রধানত ঘটনা। একটা ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনার ক্রিয়াশীলতা উপস্থিত থাকবে শিরোনামে। 'মানুষ কুকুরকে কামড়েছে' হল একটি দারুণ খবর। এই খবরে 'কামড়েছে' ক্রিয়াপদটি আছে বলে শিরোনামটি হয়েছে জোরালো। কোন ঘটনার কথা বলতে গেলে ঘটনাটি ঘটার কথা অনিবার্যভাবে আসবে। সে দুর্ঘটনা হোক অথবা সামরিক অভ্যুত্থান হোক, যাই ঘটুক না কেন তা সঠিকভাবে বলতে গেলে ক্রিয়াপদের সঠিক ব্যবহার করতেই হবে। একটি ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য-ক্রিয়াপদের মাধ্যমেই তুলে ধরা যায়।

শিরোনামে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় তার রূপ হয় বর্তমান কালের। আজকে যা ছাপা হচ্ছে তা কালকের ঘটনা। স্বভাবতই অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন? একটু ভেবে দেখুন একটা খবর পাঠক যখন পাচ্ছে তখনও সেটা টাটকা ও তাজা। এইমাত্র পাঠক জানলো কী ঘটেছে। এই তরতাজা টাটকা ভাবটি ধরে রাখার জন্যই বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়। পাঠকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে ঘটনাটি এইমাত্র ঘটেছে। অনেক সময় ক্রিয়াপদ উহ্য রাখা হয়। যেমন 'শুরুতেই অঘটন', এই শিরোনামে ক্রিয়াপদটি উহ্য রয়েছে। 'ঘটলো' এই ক্রিয়াপদটি পাঠক বুঝে নেবে এমনটা ধরে নিয়েই শিরোনামটি তৈরি করা হয়েছে।

মন্তব্য থাকবে না শিরোনামে, থাকবে শুধু খবর। যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠা বজায় রেখে শিরোনাম লিখতে হবে। মন্তব্য পক্ষপাতের অবতারণা করে। পাঠকরা খবর চায়, মতামত চায় না। শিরোনামে যদি মন্তব্য থাকে তাহলে পাঠকরা বুঝবে জোর করে পাঠকের মতামতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে কাগজের বিশ্বাসযোগ্যতা কমবে, নিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুণ্ন হবে।

অনেক সময় শিরোনামে কোটেশন ব্যবহার করা হয়। যদি কারোর উক্তি ঢোকানো হয়, তাহলে কোটেশন ব্যবহার করা উচিত। সন্দেহ থাকলেও কোটেশন ব্যবহার হতে পারে। যেমন কোন মন্ত্রীর মেয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন খবর এসেছে। পুলিশ কিন্তু আত্মহত্যার কথা বলছে না। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে এটা আত্মহত্যার ঘটনা। সন্দেহ থেকে যাচ্ছে তাই কোটেশন দিয়ে "মন্ত্রীর মেয়ের আত্মহত্যা" শিরোনাম তৈরি করা যেতে পারে।

উপ-শিরোনাম ঃ সংবাদের দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে বসে এই শিরোনাম। একটি নতুন প্রসঙ্গ অথবা বিষয়ের অবতারণা করার সময় এই উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। পাঠককে সংবাদের বিষয়বস্তু ভালভাবে বোঝানোর জন্যই এই শিরোনাম দেওয়া হয়। একটি নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও এইরকম শিরোনাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একটি বিষয়ের সঙ্গে নানান প্রসঙ্গ জড়িয়ে থাকে। কোন নতুন প্রসঙ্গে যাবার সময় উপ-শিরোনাম দিয়ে শুরু করা ভাল।

উপ-শিরোনাম পাঠকের চোখকে বিশ্রামও দেয়। লম্বা লেখার মধ্যে উপ-শিরোনাম মরুদ্যান হয়ে ওঠে। ঘন অক্ষরের ধূসরতা ভেঙে স্বস্তি দেয় পাঠককে। লাইনের মাঝখানে এমনভাবে সেট করা হয় যাতে লাইনের দুপাশে সমান বেশি সাদা জায়গা থাকে। খুব অল্প শব্দে লিখতে হয় এই শিরোনাম। কারণ জায়গা থাকে খুব কম। উপশিরোনাম দু'ধরনের হয়। সেন্টারড হেড এবং সাইড হেড। কলামের মাঝখানে বসলে সেন্টারড এবং বাঁদিক বা ডানদিক চেপে বসলে সাইড হেড। ঘন ঘন উপশিরোনাম দেওয়া ঠিক নয়। চার-পাঁচ অনুচ্ছেদ অন্তর একটি করে উপশিরোনাম দেওয়া যেতে পারে।

১১৭.১৩ সারাংশ

সম্পাদনার অন্যতম উপাদান হল টাইপসজ্জা। ছাপার কাজে বিভিন্ন ধরনের ও মাপের টাইপ ব্যবহার করা হয়। টাইপের মাপ হয় বিভিন্ন রকমের। ৬ থেকে ৭২ পয়েন্ট পর্যন্ত মাপ হতে পারে। বর্তমানে কমপিউটার স্ক্রীনে যে কোন মাপের টাইপ তৈরি করা সম্ভব। টাইপের পরিবার সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। সম্পাদনার সময় কী মাপের এবং কোন ধরনের টাইপ ব্যবহৃত হবে তা নির্দেশ করতে হয়।

মার্জিন যথাযথ হয়েছে কিনা সেটা দেখাও জরুরি। সাদা অংশ অঙ্গসজ্জাকে সুন্দর করে তোলে। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে যেতে সুবিধা হয় এই মার্জিনের জন্য।

শিরোনাম সম্পাদনা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোন রচনার একটি শিরোনাম থাকে। বিশেষ করে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে শিরোনাম সংবাদের মূল বিষয়কে অল্প কথায় একেবারে প্রথমেই প্রকাশ করে। পাঠক শিরোনাম পড়েই জেনে যায় সংবাদের মূল বিষয়। শিরোনামের সূচনা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে শিরোনাম বিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে পাঠক কাগজ হাতে নিয়ে প্রথমেই দেখেন শিরোনাম।

শিরোনাম পাঠককে তার পছন্দের বিষয়টি খুঁজে নিতে সাহায্য করে। একে বলে শিরোনামের সূচিপত্রের কাজ। বড় শিরোনাম মানেই বড় খবর, ছোট শিরোনাম মানে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম খবরের কাগজে ব্যবহৃত হয়। এদের আলাদা আলাদা নাম আছে।

শিরোনাম রচনায় অবর-সম্পাদককে দেখতে হবে যাতে সংবাদের বিষয় ঠিকঠাকভাবে প্রকাশিত হয় শিরোনামে। অল্প কথায়, সঠিক শব্দ প্রয়োগে ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে নাটকীয় মুহূর্তকে ধরতে হবে। কোনরকম পক্ষপাত রাখা চলবে না। মতামত দেওয়াও ঠিক নয় শিরোনামে। অনেক সময় বিষয়কে ভালভাবে বোঝানোর জন্য ও পাঠযোগ্যতা বাড়াবার জন্য উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা হয়।

১১৭.১৪ অনুশীলনী—৪

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) .... ও .... একই মাপের হয় না।

(খ) ইংরেজিতে টাইপ ফেস দু'রকম .... ও ....।

(গ) .... সাদা অংশ .... বাড়িয়ে দেয়।

(ঘ) .... নির্যাসটুকু ধরা থাকে ....।

(ঙ) .... চল সুরু হয় .... শতকের মধ্যভাগে।

২। সেরিফ আর সান্স টাইপের পার্থক্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

৩। তিন ধরনের টাইপ-এর সাধারণ পরিচয় দিন।

৪। সংবাদপত্রের টাইপ সজ্জার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। হলুদ সাংবাদিকতার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৬। সংবাদের শিরোনাম রচনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিন।

১১৭.১৫ মূলপাঠ—৫ ঃ অঙ্গসজ্জা বিভিন্নরূপ

অঙ্গসজ্জা ঃ সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হল অঙ্গসজ্জা। একটি পাতায় যে লেখাগুলো ছাপা হবে সেগুলোকে সাজাতে হয়। এলোমেলো করে খুশীমত সাজালে হবে না, পাঠোপযোগী ও দৃষ্টিনন্দন করে সংবাদগুলিকে পরিবেশন করতে হবে। ছবি, শিরোনামের বৈচিত্র্য, কার্টুন, রুল প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা করা হয়। একটি কাগজের যদি ১২টি পৃষ্ঠা থাকে তাহলে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাকে আলাদাভাবে সাজাতে হবে। যেমন প্রথম পৃষ্ঠায় সাধারণত ৭ থেকে ৮টি সংবাদ কাহিনী থাকে। বড় ছবি থাকলে সংবাদ কাহিনী ৬-য়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে যে জায়গা থাকে সেখানেই অঙ্গসজ্জা করতে হয়। প্রথম পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পৃষ্ঠাই হল সংবাদপত্রের প্রাথমিক পরিচয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ছবি এই পাতাতেই থাকে।

প্রথম পাতায় সব সংবাদের জায়গা হয় না। সবচেয়ে বড় খবরকে প্রথম পাতায় এনে বাকী খবরকে

নিয়ে যাওয়া হয় ভিতরের পাতায়। তবে সবসময় চেষ্টা করা হয় যাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথম পাতায় জায়গা পায়। খেলাধূলা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের জন্য আলাদা পাতা থাকে। ঐ সব পাতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্পাদকীয় মতামতের জন্য আলাদা একটি পাতা থাকে। সেখানে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও উত্তর সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র প্রভৃতি বিষয় ছাপা হয়। উত্তর সম্পাদকীয় হল সম্পাদকীয় নিবন্ধের পরে মধ্যবর্তী জায়গায় যে রচনা প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠাসজ্জার কাজ শুরু হয় ডামি শিটের ওপর। ডামি শিট হল কাগজের পাতার একটি নকল রূপ। কাগজের মাপ, কলামের মাপ সবই উল্লিখিত থাকে এই শিটে। বিজ্ঞাপন বিভাগ থেকে এই ডামি শিট এনে পৌঁছয় সম্পাদকীয় বিভাগে। যে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন ছাপা হবে সেসব জায়গায় চিহ্ন দিয়ে বিজ্ঞাপনের জায়গা বুক করা থাকে। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর-সম্পাদক বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট জায়গা বাদ দিয়ে যে জায়গা থাকে সেখানে বিভিন্ন সংবাদকে সাজান। কলাম, সেন্টিমিটার নির্দেশ করে এক একটি সংবাদকে উপযুক্ত জায়গায় বসিয়ে, ছবির জায়গা নির্দিষ্ট করে, রুল বক্স কোথায় কী বসবে তা নির্ধারণ করলেই অঙ্গসজ্জার প্রাথমিক কাজটুকু সারা হয়ে যায়। বিভিন্ন সংবাদ একেকরকম আয়তন নিয়ে পরিবেশিত হয়। কোন সংবাদ তিন কলাম জায়গা নিতে পারে, আবার কোন সংবাদ এক কলাম জায়গা নিতে পারে। ছ, সাত কলাম জায়গা নিয়েও সংবাদ পরিবেশিত হয় অনেক সময়। কোন সংবাদ কতটা জায়গা পাবে সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাই ঠিক করেন।

অঙ্গসজ্জার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সংবাদের মূল্য সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে সবচেয়ে ভাল জায়গায় দিতে হবে। পাঠক চোখ রাখলেই যেন দিনের প্রধান খবরকে খুঁজে পায়। বড় হরফে, বেশি জায়গা নিয়ে এই সংবাদটি পরিবেশিত হবে। এরপর গুরুত্বের ক্রমানুসারে অন্যান্য সংবাদকে সাজাতে হবে। সংবাদ কাহিনীগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হবে যাতে গুরুত্ব অনুধাবন করে খুশীমতো পাঠক সহজে একটি বিষয় থেকে আরেকটি বিষয়ে চলে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা অঙ্গসজ্জাকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে হবে। পাঠক যেন পাতায় চোখ রেখে উপলব্ধি করতে পারে সজ্জাটি সুন্দর ও স্মার্ট।

নীতি ঃ অঙ্গসজ্জার মূল নীতি হল পাঁচটি—ভারসাম্য (balance), কেন্দ্রবিন্দু (focus), বৈপরীত্য (contrast), গতি (movement) এবং একতা (unity)। ভারসাম্যতা দু'ধরনের হতে পারে—বিধিসম্মত ও বিধি বহির্ভূত ভারসাম্যতা। অঙ্গসজ্জায় বিধিসম্মত ভারসাম্য নিয়ে আসা খুবই সহজ। এই সজ্জার মূল কথাই হল পৃষ্ঠার ডানদিক ও বাঁদিক একইভাবে সাজাতে হবে। অর্থাৎ ডানদিকে তিন কলাম সংবাদ থাকলে বাঁদিকেও তিন কলাম সংবাদ রাখতে হবে। একইভাবে ডান ও বাঁদিকে এক কলাম সংবাদ বসবে। ওপর নীচেও সাদৃশ্য থাকা দরকার। তাই ওপর নীচে সমান ওজনের গুরুত্ব দিতে হবে।

বিধিবর্হির্ভূত ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এত বাধ্যবাধকতার চাপ নেই। সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য নিয়ে আসাটাই বড় কথা। শিরোনাম, কলাম, রুল, ছবি ব্যবহার করে ভারসাম্যের চাহিদা মেটানো যায়। এই ধরনের অঙ্গসজ্জার প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে ভারসাম্যের সম্পর্ক রয়েছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দু স্থির করতে হয়। কেন্দ্রবিন্দু স্থলই হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানেই থাকবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি। পাঠকের দৃষ্টিকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে কেন্দ্রবিন্দুর ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রবিন্দুর স্থান একেক কাগজে একেক রকম হয়। কোন কাগজে ডানদিকে থাকে, আবার কোন কাগজে বাঁদিকে থাকে। কেন্দ্রবিন্দু থেকে চোখ ক্রমশ সরে যাবে বিভিন্ন দিকে। চোখের গতি বাঁদিকে ডানদিকে তারপর আস্তে আস্তে নীচের দিকে সরে যায়।

অঙ্গসজ্জায় বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন আছে। নান্দনিক ও কার্যকরী উভয়দিক থেকে বৈপরীত্য অঙ্গসজ্জাকে সফল করে তোলে। দু'রকমের হরফসজ্জা দিয়ে বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এতে সৌন্দর্যও যেমন বোঝানো যায় তেমনি সংবাদের গুরুত্বের প্রতিও পাঠকের আকর্ষণ ধরে রাখা যায়। ডিসপ্লে ও বডি টাইপ দিয়ে তারতম্য নিয়ে আসা যায়। আবার বোল্ড ফেস ও লাইট ফেস টাইপ দিয়েও বৈপরীত্য আনা যায়। বিভিন্ন মাপের শিরোনাম সহজেই বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

যে কোন শিল্পকর্মের সঙ্গে গতির যোগ থাকে। অঙ্গসজ্জাও এক ধরনের শিল্পকর্ম বলা যেতে পারে। তাই অঙ্গসজ্জাতেও গতি আনা প্রয়োজন। পাঠকের দৃষ্টি একটি পাতায় ঘুরে ফিরে সংবাদ খোঁজে। একটি সংবাদের কিছুটা পড়ে অন্য শিরোনামে চোখ চলে যায়। তারপর আবার অন্য সংবাদে। এটা যত সহজে হতে পারবে তত বলা যাবে অঙ্গসজ্জা সফল হয়েছে।

অপর এক অপরিহার্য দিক হল একতা। একই পরিবারের হরফ ব্যবহার করে সহজে একতা নিয়ে আসা যায়। যেমন সেঞ্চুরি বোল্ড টাইপ ব্যবহার করলে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে কাগজের মৌলিকত্ব বজায় থাকে। একেকটি কাগজে একেক ধরনের টাইপ ব্যবহার করা হয়। পাঠক ঐ হরফের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। স্টেটস্‌ম্যান ও টেলিগ্রাফ কাগজ বিশেষ একধরনের হরফ ব্যবহার করে। শুধু হরফ দিয়ে নয়। ছবি, রুল ও সংবাদ কাহিনী বিন্যাস দিয়েও এই একতা ধরে রাখা যায়।

অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন রূপ ঃ অঙ্গসজ্জারও রকমফের আছে। প্রাথমিকভাবে অঙ্গসজ্জা সমান্তরাল (Horizontal) হতে পারে আবার উলম্ব (Vertical) হতে পারে। সমান্তরাল অঙ্গসজ্জায় মূল ঝোঁক থাকে সংবাদগুলিকে সমান্তরালভাবে পরিবেশন করার দিকে। সংবাদগুলিকে দু-তিন কলামে পরিবেশন করলেই এটা সম্ভব। উলম্ব অঙ্গসজ্জায় মূল ঝোঁকটা থাকে ওপর থেকে নীচে। এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যাতে পাঠকের চোখ উলম্বগতিতে অনুসরণ করে।

অঙ্গসজ্জার রূপ অনুযায়ী বেশ কয়েক ধরনের অঙ্গসজ্জা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এগুলি হল ব্রেস মেক-আপ (Brace make-up), ম্যাগাজিন মেক-আপ (Magazine make-up), সার্কাস লে-আউট (Circus lay-out)। মডুলার লে-আউট (Modular lay-out), ট্যাবলয়েড মেক-আপ (Tabloid make-up)।

ব্রেস মেক-আপে গুরুত্ব দেওয়া হয় পৃষ্ঠার ওপরের ডানদিকের কোণে। অনেকটা হুকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। ম্যাগাজিন মেক-আপ নান্দনিক বোধ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। সাধারণত সাময়িক পত্রের আদলে এই মেক-আপ তৈরি হয়। সাম্প্রতিককালে এই মেক-আপের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্কাস লে-আউটে বড় শিরোনাম, রঙিন হরফ ও আলোকচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। বিন্যাসে তিনটি চক্রের একটা আদল উঠে আসে। তিন রিং বিশিষ্ট সার্কাস থেকে এই লে-আউটের উদ্ভব হয়েছে। ওপরের দিকের সজ্জা এমন করা হয় যাতে মনে হয় বড় কিছু ঘটেছে। মডুলার লে-আউটে আয়তক্ষেত্রের মাপে সংবাদ কাহিনীগুলিকে পরিবেশন করা হয়। ধরা যাক, চারটি সংবাদ কাহিনী পৃষ্ঠার চার কোণে দেওয়া হল। আটটি কাহিনীও হতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রই নিজ স্বাতন্ত্র নিয়ে টিকে থাকে। তবেই সামগ্রিকভাবে পৃষ্ঠার একতাকে কখনই নষ্ট করবে না। ট্যাবলয়েড মেক-আপ নাটকীয় পরিবেশনার ওপর বেশি জোর দেয়। ট্যাবলয়েড হল ছোট কাগজ। প্রভাতি সংবাদপত্রের যে মাপ তার অর্দ্ধেক হল ট্যাবলয়েডের মাপ। একদম প্রথম পাতায় ছবি ও সংক্ষিপ্ত বড় শিরোনাম অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থিত করা হয়। দেখামাত্রই যেন পাঠকের চোখ আটকে যায়। সাধারণত সান্ধ্য কাগজের মেক-আপ এমন হয়।

অঙ্গসজ্জার সময় কতগুলি সাধারণ সূত্র মেনে রাখতে হবে। এগুলো মনে রাখলে কাজের সুবিধা বেশি। এগুলো হল— (১) কাগজের নাম থাকবে সবচেয়ে উঁচুতে। (২) ওপরের বাঁদিক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। বড় খবর ঐ জায়গাতে রাখাই শ্রেয়। (৩) সংবাদ কাহিনীগুলি গুরুত্ব-অনুযায়ী নিচে নেমে যাবে। (৪) শিরোনামের মাপ ক্রমশ নীচের দিকে ছোট হবে। (৫) একটি শিরোনাম যেন আরেকটি শিরোনামের সঙ্গে মিশে না যায়। সামান্য হলেও বৈপরীত্য রাখতে হবে। (৬) শিরোনাম বিন্যাসে একটু বৈচিত্র্য আনা দরকার। (৭) ছবির ব্যবহার হলে ভাল, কারণ তাতে বডি টাইপের ধূসরতা ভেঙে যায়। (৮) দু-কলামের মধ্যে বেশি সাদা জায়গা রাখা উচিত নয়। সাদা জায়গা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (৯) উৎকর্ষতার জন্য প্রয়োজনে নিয়ম ভাঙতে হবে, এতে অঙ্গসজ্জার সৃজনশীল দিকটি অটুট থাকে।

১১৭.১৬ সারাংশ

বিভিন্ন সংবাদকে পাঠোপযোগী করে একটি পৃষ্ঠায় সাজাতে হয়। সাজানোর এই প্রক্রিয়াকে বলে অঙ্গসজ্জা। সম্পাদনার একেবারে শেষ স্তর হল অঙ্গসজ্জা। ডামি সীটের ওপর বিভিন্ন মাপের শিরোনাম সহ সংবাদ-কাহিনী, ছবি, রুল, বক্স প্রভৃতির সাহায্যে পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা তৈরি হয়। সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী ঠিক হয় কোথায় কোন্ সংবাদ যাবে। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলিকে নিয়ে আসা হয় প্রথম পাতায়। আবার তার মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে সবচেয়ে বড় হরফে বেশি জায়গা নিয়ে ওপরের দিকের সহজে চোখে পড়ার মতো জায়গায় রাখা হয়। প্রতিটি পাতাকেই আলাদা করে সাজাতে হয়। অঙ্গসজ্জার কয়েকটি নীতি আছে। এগুলি হল ভারসাম্য, কেন্দ্রবিন্দু, বৈপরীত্য, গতি এবং একতা।

অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন রূপ আছে। এক একটির আদল একেক রকমের। কোথাও উলম্ব গতির ওপর জোর দেওয়া হয়, আবার কোথাও সমান্তরাল গতির ওপর প্রাধান্য থাকে। কোন অঙ্গসজ্জায় ওপরের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার কোন সজ্জায় তিনটি জায়গায় গুরুত্ব সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

অঙ্গসজ্জা কয়েকটি সাধারণ সূত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এগুলো মানলে সজ্জা তৈরি করতে সুবিধা বেশি। যেমন কাগজের নাম থাকবে উঁচুতে। বাঁদিকে বড় খবর থাকবে, গুরুত্ব অনুযায়ী খবর নিচের দিকে নামবে। বিন্যাসে বৈচিত্র্য থাকবে। ছবির ব্যবহার হবে ইত্যাদি।

১১৭.১৭ অনুশীলনী (মূলপাঠ—৪ ও ৫)

১। সম্পাদনায় টাইপ সজ্জার গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে লিখুন।

২। শিরোনাম কাকে বলে? শিরোনাম কে রচনা করেন? শিরোনাম রচনার কৌশল কী?

৩। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জা বলতে কী বোঝেন?

৫। অঙ্গসজ্জার মূলনীতিগুলি কী?

৬। অঙ্গসজ্জার উদ্দেশ্য কী? দুটি অঙ্গসজ্জার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১৭.১৮ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১, ২, ৩ ৪)

অনুশীলনী—১

১। (ক) ক্লাস এইট, সংবাদপত্র।

(খ) টেবিল, চেক পয়েন্ট।

(গ) সংক্ষিপ্ততা, সম্পাদনার, গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) পিরামিড, অনুসরণ, উল্টো পিরামিড।

২। সংবাদ রচনার ভাষা হবে অত্যন্ত সহজ সরল।

৩। 'সম্পাদকীয় নীতি'—প্রাসঙ্গিক আলোচনা অবলম্বনে উত্তর তৈরি করুন।

অনুশীলনী—২

১। 'সূচনা' অংশ অবলম্বনে উত্তর তৈরি করুন।

২। পুনর্লিখন অংশ অবলম্বনে উত্তর প্রস্তুত করুন।

অনুশীলনী—৩

১। 'সম্পাদনা চিহ্ন' উপবিভাগটি ভাল করে পড়ে উত্তর লিখুন।

২। 'অনুচ্ছেদ' সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে তৈরি করুন।

অনুশীলনী—৪

১। (ক) শিরোনাম, সংবাদ, অক্ষরে।

(খ) সেরিফ, সান্স, (গ) মার্জিনের, পাঠযোগ্যতা, (ঘ) সংবাদের শিরোনামে।

(ঙ) শিরোনামের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উনিশ।

২। 'সেরিফ' সূক্ষ্ম রেখাবিশিষ্ট। 'সান্স' একটু মোটা, ভোঁতা।

৩। তিন ধরনের টাইপ সংক্রান্ত আলোচনা অবলম্বনে উত্তর তৈরি করুন।

৪। 'টাইপ সজ্জা' উপবিভাগ অনুসরণে উত্তর প্রস্তুত করতে হবে।

৫। 'শিরোনাম শীর্ষক' আলোচনা অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক উত্তর তৈরি করুন।

১১৭.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় — *বিষয় সাংবাদিকতা*।

২। কৃষ্ণ ধর — *সংবাদ ও সাংবাদিকতা*।

৩। Patanjali Sethi – *Professional Journalism.*

একক ১১৮ ❑ প্রসঙ্গ সম্পাদনা

গঠন

১১৮.১ উদ্দেশ্য

১১৮.২ প্রস্তাবনা

১১৮.৩ মূলপাঠ—১ সম্পাদক ও সম্পাদকীয়

১১৮.৪ সারাংশ

১১৮.৫ অনুশীলনী—১

১১৮.৬ মূলপাঠ—২ গ্রন্থ সম্পাদনা

১১৮.৭ সারাংশ

১১৮.৮ অনুশীলনী—২

১১৮.৯ মূলপাঠ—৩ সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা

১১৮.১০ সারাংশ

১১৮.১১ অনুশীলনী—৩

১১৮.১২ মূলপাঠ—৪ প্রুফরিডিং

১১৮.১৩ সারাংশ

১১৮.১৪ অনুশীলনী—৪

১১৮.১৫ উত্তর-সংকেত (অনুশীলনী—১, ২, ৩, ৪)

১১৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সম্পাদনা—খবরের কাগজ সম্পাদনা, গ্রন্থ সম্পাদনা ও সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনায় সম্পাদক ও সম্পাদনার রীতি-নীতি সম্পর্কে সাধারণভাবে যা জানতে পারবেন তা হল ঃ

- খবরের কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য;
- গ্রন্থ প্রকাশে গ্রন্থ-সম্পাদক ও সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা;
- সাময়িকপত্র প্রকাশে সম্পাদকের ভূমিকা;
- প্রকাশনায় প্রুফ রিডিং কী ও কেন এবং তার প্রয়োজনীয়তা।

১১৮.২ প্রস্তাবনা

একসময় সংবাদ, সাময়িকপত্রে সম্পাদকের একক কৃতিত্ব প্রকাশ পেত। তিনি স্মরণীয় হতেন। ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ এখন আর নেই। পরিবর্তে, বর্তমান কালের সংবাদপত্রকে একটি যৌথ প্রকাশনা বলা যায়।

এ যুগে সম্পাদক ক্রমশ সংবাদপত্রের নেপথ্যে চলে গেছেন—প্রাধান্য পাচ্ছেন কয়েক জন সাংবাদিক। বিশেষ কলাম লেখক। কিন্তু সম্পাদক-এর দায়-দায়িত্ব কোন অংশে কমেনি। কারণ আজকের সংবাদপত্র বৃহৎ শিল্পে পরিণত হওয়ায় পত্রিকা পরিচালনায় দায়দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। পত্রিকা প্রশাসন আজ বহু শাখায়িত, তার সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন। এই সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতায় একটি পত্রিকা দৈনিক প্রকাশিত হয়। অনেক পাঠকই এর সংবাদ রাখেন না। এককেকটিতে আপনারা সংবাদপত্র সাময়িকপত্র ও গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পাদকের বহুমুখী দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিচয় পাবেন।

১১৮.৩ মূলপাঠ—১ ঃ সম্পাদক ও সম্পাদকীয়

সম্পাদক ঃ আধুনিক সংবাদপত্রে সব সময় সম্পাদককে নিজহাতে সম্পাদকীয় লিখতে হয় না। তবে তিনি সময় করে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ওপর চিন্তাশীল কোন সম্পাদকীয় লিখলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। সম্পাদকের দেশ-কাল, সমাজ-রাজনীতি-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ, পাঠক রুচি ও জ্ঞানচিত্ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং পত্রিকা পরিচালনা সম্পর্কে প্রশাসনিক দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়। সংবাদপত্রের মুদ্রণ ও অঙ্গবিন্যাস সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান, সংবাদপত্রের ভাষা-পরিভাষা, উপস্থাপনার কলা কৌশল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানতে হয়। সাম্প্রতিক কালের পেশাদার সম্পাদক জনপ্রিয় সাংবাদিক থেকে অনেক সম্পাদক পদে বৃত হওয়ায় লেখার অভিনবত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং অবহিত। তিনি দিনে এক বা একাধিকবার বিভাগীয় সম্পাদক সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে প্রকাশিত সংবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্য কাগজের সঙ্গে তুলনায় আলোচনা করে। বিগত দিনের সংবাদের প্রয়োজনীয় ‘ফলো-আপ’ ও কাগজের

EBG (P-8 M 30-33)—16

নীতি পুনরালোচনা করে, পরিশেষে সেদিনের সম্পাদকীয়তে কোন বিষয় গুরুত্ব পাবে এবং সেটি কে লিখবেন তা বলে দেন। সংবাদপত্রের পরিভাষায় এই সম্পাদকীয় লেখককে বলা হয় ‘লিডার রাইটার’। তিনি পত্রিকার গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র ও পুরনো সংবাদের প্রাসঙ্গিক ক্লিপিংস আনিয়ে রীতিমত পড়াশুনা করে তাঁর সম্পাদকীয় তৈরি করেন। সম্পাদক সবসময় সম্পাদকীয় লেখেন না বলে ‘লিডার রাইটার’-এর দায়িত্ব অনেক।

সম্পাদকীয় ঃ খবরের কাগজে শুধু সংবাদ থাকে না। কাগজের নিজস্ব মতামত ও মূল্যায়নও থাকে। একটি আলাদা পৃষ্ঠায় নিবন্ধ আকারে এই মতামত ও মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়। পাঁচ, ছশো শব্দের এই নিবন্ধকে বলা হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এর গুরুত্ব অপরিসীম। কাগজের নিজস্ব নীতি, স্বাতন্ত্র বিচারবোধ প্রতিফলিত হয় এই প্রবন্ধে। সম্পাদকীয়কে বলা হয় সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বর। সংবাদের মধ্যে কাগজের নিজস্বতা সেভাবে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ নেই। কিন্তু সম্পাদকীয় নিবন্ধে কাগজ নিজের স্বাতন্ত্র, ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

সম্পাদকীয় লেখা হয় সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বিষয়ের ওপরে। বাজেট পেশ হলে, মন্ত্রীসভার কোন তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, বড় কোন আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা দিলে অথবা কোন বড় ঘটনা ঘটলে, তার ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করা হয়। এইসব বিষয় ও ঘটনার ওপরে কাগজের নিজস্ব মূল্যায়ন ও বিচারবোধ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় এই নিবন্ধে।

সহ-সম্পাদকেরা সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্বে থাকেন। সাংবাদিকতার পরিভাষায় বলা হয় লিডার রাইটার। প্রতিদিন সম্পাদক সহ-সম্পাদকদের নিয়ে সভা করে ঠিক করেন কী বিষয়ের ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হবে এবং ঐ লেখার দায়িত্বে কে থাকবেন। মতামতের ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপরেখাও মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় এই সভায়। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদকীয় লেখক নিবন্ধ রচনার কাজ শুরু করেন।

সম্পাদকীয় নিবন্ধের কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে।

উদ্দেশ্য (১) ঃ পাঠককে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা সম্পাদকীয়র অন্যতম উদ্দেশ্য। পরিবেশ সংরক্ষণের ওপরে যদি সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা হয় তাহলে এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পায়। বহু নতুন তথ্য পাঠকের গোচরে আসে। বিশ্লেষণ যুক্তি ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী পাঠককে নতুন করে ভাবায়, প্রভাবিত করে।

(২) ঃ সম্পাদকীয়র মধ্যে ব্যাখ্যাও থাকে। জটিল বিষয়কে ব্যাখ্যা করে না দিলে পাঠক বুঝবে না। সাংবিধানিক সংকট, আর্থিক নীতির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা না করলে সাধারণ পাঠক বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ব্যাখ্যা করা সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) ঃ অনেকসময় সম্পাদকীয় পাঠকের কাছে সরাসরি আবেদন রাখে। আইন মেনে চলার জন্য ধর্মান্ধতা থেকে দূরে থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আবেদন সম্বৃদ্ধ সম্পাদকীয় নিবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পাঠককে প্রণোদিত করাই এই ধরনের সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য। যে বিষয়ের ওপর আবেদন রাখা হচ্ছে তার কার্যকারীতা ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়।

(৪) ঃ সক্রিয় প্রতিবাদ জানানোও সম্পাদকীয়র অন্যতম উদ্দেশ্য। সরকার যদি কোন ভূল নীতি অনুসরণ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সরব হয় সম্পাদকীয়। কোন অন্যায়, অবিচার ও কেলেংকারী ফাঁস হলে সম্পাদকীয়তে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

(৫) ঃ কাগজের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করাও সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়। আর্থ-সামাজিক সম্পর্কিত বিষয়ে সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত কী তা জানা যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠ করে, উদার অর্থনৈতিক নীতি যখন ঘোষিত হয়েছিল ভারতের সব সংবাদপত্রই সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিল তাদের মতামত। কাগজের নিজস্ব অনুসৃত নীতিকে অনুসরণ করেই এই মতামত গড়ে উঠেছিল। বিলগ্নীকরণ, বাবরি মসজিদ বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচিত হয়েছে তাতে বোঝা গেছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গী কী। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে সংবাদপত্রের নীতি।

সম্পাদকীয় লেখার সময় প্রথমেই যে বিষয়টি লেখা হচ্ছে তা পাঠককে ধরিয়ে দিতে হবে। সাধারণত দু-একদিন আগের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ওপরে সম্পাদকীয় লেখা হয়। ঘটনাটি পাঠক জানেন, শুধুমাত্র সূত্রটুকু ধরিয়ে দেওয়া যাতে সে বুঝতে পারে কী বিষয়ে লেখা হচ্ছে। অতি সংক্ষেপে এই সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার কাজটুকু সারতে হবে। একেবারে সাদামাঠাভাবে লিখলেই হবে না। সামান্য চমক থাকলে ভাল। বর্ণনাত্মক না হয়ে বিশ্লেষণাত্মক হয়ে ওঠাটাই কাম্য। পাঠককে বিষয়টি ধরিয়ে দিয়ে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। যুক্তি পরিসংখ্যান তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে অণ্বেষণ করতে হবে বিষয়টির তাৎপর্য। যাইহোক না কেন তার রূপ, অনিবার্যভাবে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে বিচারবোধ ও মতামত যা মন্তব্যের আকারে পরিস্ফুট হবে। একেবারে শেষে আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে কাগজের নিজস্ব অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি অতি সংক্ষেপে, বুদ্ধিদীপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্পাদকীয় রচনার জন্য প্রয়োজন মননঋদ্ধ যুক্তিপরম্পরা, শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য, উপমার দক্ষ প্রয়োগ

ও অনন্য ভাষাশৈলী যার মধ্যে উদ্ভাসিত হবে অপরিমিত সৌন্দর্য ও পর্যাপ্ত রসবোধ। এক একটি কাগজের একেক ধরনের সম্পাদকীয় রচনাশৈলী রয়েছে। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই শৈলী খুবই সাহায্য করে। পড়লেই বোঝা যায় এটা আনন্দবাজার পত্রিকার। অন্যটা বর্তমানের। তির্যক মন্তব্য করার দক্ষতার ওপর সম্পাদকীয়র সার্থকতা অনেকটা নির্ভর করে। এক সময় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ও সত্যেন মজুমদারের সম্পাদকীয় তির্যক মন্তব্যের অনন্যতায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

(৬) ঃ সুন্দর গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে পাঠককে আনন্দ দেওয়াও সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদ্দেশ্য বলে গণ্য হয়। রমনীয় রচনা হাস্যরস ও ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় সে অপরূপ আবহ তৈরি করে তাতে পাঠকের মন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। চিত্তের বিনোদন ঘটে। উপমায়, অলংকারে, শব্দ নির্বাচনের যাদুতে পাঠককে শুধুমাত্র আনন্দ দেওয়াই সম্পাদকীয় রচনার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

রচনা পদ্ধতি ঃ সংবাদ লেখার সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়। বস্তুনিষ্ঠার নীতি মেনে ঠিক যা ঘটেছে তাই লিখতে হবে, কোনরকম মন্তব্য বা মতামত লেখার মধ্যে ঢোকানো যাবে না। কিন্তু সম্পাদকীয় রচনার ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা অনেক বেশি। সম্পাদকীয় লেখক কাগজের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মন্তব্য ও মতামত প্রকাশ করতে পারেন। তবে অবশ্যই যুক্তিযুক্তভাবে তা করতে হবে। যে কোন যুক্তিকেই হতে হবে তথ্যনিষ্ঠ। সাদাকে কালো বলে চালানো যাবে না। বিশ্লেষণ করে, তুলনা করে যে কোন ধরনের মতামত ও মন্তব্য শুধু প্রকাশ করা যাবে। সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশের বিষয়টি সম্পাদকীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

১১৮.৪ সারাংশ

সম্পাদকের নির্দেশে সহকারী সম্পাদকদের যে কোন একজন সম্পাদকীয় লেখবার দায়িত্ব পেতে পারেন—তাকে তখন 'লিডার রাইটার' বলা হয়। তিনিই তথ্য সূত্র অনুসন্ধান করে প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ তৈরি করেন। প্রচলিত একটি কথা আছে—সম্পাদকীয় হোল কাগজের কণ্ঠস্বর। কাগজের নিজস্বতা কী তা বোঝা যায় সম্পাদকীয় পড়ে। সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের ওপর কাগজের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী কী তা প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমালোচনামূলক মন্তব্য করা হয়, যা পড়ে পাঠক প্রভাবিত হয়। সম্পাদকীয়র কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলি হল, পাঠককে অবহিত করা। ব্যাখ্যা করা। পাঠকের কাছে আবেদন রাখা, প্রয়োজনে সক্রিয় প্রতিবাদ করা, কাগজের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মাঝে মাঝে পাঠকের চিত্ত বিনোদন করা।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনার নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। সূচনা, মধ্যবর্তী স্তর এবং উপসংহারের যথেষ্ট উপযোগীতা রয়েছে। শব্দ নির্বাচন, উপমার প্রয়োগ, যুক্তিপরম্পরার ব্যবহার এবং ভাষাশৈলী নিবন্ধকে এক বিশেষ মাত্রা দেয় যা কাগজের নিজস্বতাকে তুলে ধরে। যে কোন কাগজের সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠ করলেই বোঝা যায় সেই কাগজের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে অবস্থান কী।

১১৮.৫ অনুশীলনী—১

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) .... বলা হয় সংবাদপত্রের ....।

(খ) সম্পাদকীয় লেখা হয় .... গুরুত্বপূর্ণ .... ও .... ওপরে।

(গ) .... জানানোও .... অন্যতম উদ্দেশ্য।

২। সম্পাদকীয় লেখককে ‘লিডার রাইটার বলার কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩। সম্পাদকীয় নিবন্ধের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করুন।

১১৮.৬ মূলপাঠ—২ ঃ গ্রন্থ সম্পাদনা

গ্রন্থ সম্পাদনা ঃ ঝকঝকে নতুন বই হাতে তুলতেই আমাদের রোমাঞ্চ হয়। অঙ্গ সৌষ্ঠবের সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেয়। তারপর পাতা উল্টে চলে যাই বিষয়ের গভীরে, অজানা জগৎ-এর অভ্যন্তরে। পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে, অনুচ্ছেদের পরতে পরতে মোহবিষ্ট হই বিষয়ের উৎকর্ষতায়, রচনার অভিনব চারিত্রিক বিশিষ্টতায়। একসময় গ্রন্থপাঠ শেষ হয়, মন ভরে ওঠে মনোরম পাঠের উপলব্ধিতে, অভিজ্ঞতায়। বই পড়ার আনন্দটুকুই আমরা উপভোগ করি। রচনার উৎকর্ষে মনপ্রাণ ভরে থাকে। ধন্য ধন্য করি লেখককে। খেয়াল থাকে না একটি গ্রন্থের উৎপাদনে শুধু লেখক নয়, আরো অনেকের অবদান আছে। মলাট থেকে অনুচ্ছেদ সজ্জা সব কিছুতেই রয়েছে সৃজনশীল পরিকল্পনা যার মূল স্থপতি হলেন গ্রন্থ সম্পাদক।

একটি ভালো বই মানেই উৎকৃষ্ট মানের সম্পাদিত বই। একটি যথেষ্ট উচ্চমানের পরিকল্পিত প্রয়াস। লেখক বই লেখেন, বাস্তবায়িত করেন তার ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে লেখার মধ্যে। কিন্তু এটুকু সম্পন্ন হলেই ভালমানের গ্রন্থ উৎপাদন হয় না। লেখকের সৃজনকে যথার্থভাবে গ্রন্থে আবদ্ধ করতে, পাঠযোগ্য করে গড়ে তুলতে দরকার একজন দক্ষ গ্রন্থ সম্পাদক।

সংবাদপত্র প্রকাশনায় যেমন সম্পাদনা অত্যন্ত জরুরী। ঠিক তেমনি গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও সম্পাদনার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্পাদক জানেন একটি উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ কীভাবে তৈরি হয়। কী কী শর্ত মানলে প্রকাশনার মান বজায় রাখা যায়। মলাট থেকে বাঁধাই, ছাপার মান, সজ্জা সবকিছুই সম্পাদনার মধ্যে পড়ে। শুধু বই ছাপলেই চলবে না, বই ছাপাকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। রুচি ও উপযোগিতার সমন্বয়ে আকর্ষণীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করাই সম্পাদনার উদ্দেশ্য।

সম্পাদকের কর্তব্য ঃ লেখক হলেন গ্রন্থের স্রষ্টা। কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদক হলেন গ্রন্থের রূপকার। গ্রন্থের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব তাঁর। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা থেকে মুদ্রণ, বাঁধাই পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত থাকেন। লেখক যখন রচনায় মগ্ন, সম্পাদক তখন সেই সৃজনশীল রচনাকে কত সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা, পরীক্ষা নিরিক্ষায় ব্যস্ত থাকেন। প্রয়োজনে লেখককেও তিনি পরামর্শ দিতে পারেন পরিচ্ছেদ ভাষা, লেখার আয়তন ও প্রকাশন সম্পর্কিত অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে।

ছাপার আগে রচনাটি খুঁটিয়ে পড়তে হয় সম্পাদককে। একজন দক্ষ সম্পাদক সবসময়ই হলেন একজন ভালো পাঠক। পড়তে পড়তেই তিনি পাঠযোগ্যতার বিচার করেন। লেখাটি কীভাবে উপস্থাপিত হলে, পাঠকদের মন জয় করতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা থাকে। পড়তে পড়তেই তিনি নোট রাখেন। পড়া শেষ করার পর যদি কোন অদলবদল প্রয়োজন মনে করেন তবে তা তিনি লেখককে জানাবেন। লেখক সম্পাদকের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন সম্পাদকের হাতেই তাঁর বই নিখুঁত ও মনোরম হয়ে উঠবে।

লেখক লিখতে লিখতে অনেক সময় ছোট খাট ভুল করেন। বানান ভুল, অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত ত্রুটি, প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কিত ত্রুটি, একই বিষয় পুনরায় উপস্থাপনের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে চোখ এড়িয়ে যায়। সম্পাদকের সজাগ দৃষ্টিতে এই সব ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে এবং তা সংশোধিত হয়। মুদ্রণ প্রমাদ যে কোন প্রকাশনের পক্ষে খুবই পীড়াদায়ক। যে বইয়ে বানান ভুল থাকে সে বই সম্পর্কে পাঠকের ধারণাও খারাপ হয়। সুতরাং সম্পাদনার অন্যতম কাজই হল মুদ্রণ প্রমাদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা। ছাপার কাজেও তদারকি করতে হয় তাঁকে। কী কাগজে, কী টাইপে ছাপা হবে তা তিনি নির্ধারণ করেন।

অনুচ্ছেদের উপযুক্ত প্রয়োগ পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। খুব বড় বড় অনুচ্ছেদ হলে অক্ষর বিন্যাসের ধূসরতা বৃদ্ধি পায়। চোখের পক্ষে তা একেবারেই আরামদায়ক নয়। পাঠক যাতে পড়ার সময় স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তার জন্যই সঠিকভাবে অনুচ্ছেদের ব্যবহার করা হয়। অনুচ্ছেদ দেওয়ার ফলে সাদা অংশের

ব্যবহার হয় এবং তা অক্ষরের ধূসরতা ভাঙতে সাহায্য করে। একটি পৃষ্ঠায় যদি কমপক্ষে একটি অনুচ্ছেদ থাকে তাহলে পৃষ্ঠাসজ্জা মনোরম হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে যেন অনুচ্ছেদ ব্যবহারের সাযুজ্য থাকে। শুধুমাত্র নান্দনিক হলেই চলবে না। বিষয়ের দাবির প্রতিও আনুগত্য রাখতে হবে। আবার এটাও সত্য যে অনুচ্ছেদ বিষয়ভাবনাকেও উপযুক্তভাবে মেলে ধরতে সাহায্য করে। একটি বিষয়ভাবনা পরতে পরতে প্রস্ফুটিত হয়, যদি প্রতি পরত অনুচ্ছেদের দাবী রাখে তাহলে অবশ্যই সেই দাবী মেটাতে হবে। অনুচ্ছেদ বিষয়ভাবনা এবং পৃষ্ঠাসজ্জা দুটি দিককেই সার্থকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

কোন তথ্যগত ভ্রান্তি যদি থাকে তাহলে তা দূর করতে হবে। অনেক সময় লেখক বিষয়-ভাবনাকে ভালোভাবে পরিস্ফুট করার জন্য বিভিন্ন তথ্য ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্য নেন। লেখার সময় সামান্য ভুল-ত্রুটি হতে পারে। হয়তো লেখকের অজান্তে তথ্যগত কোন ভুল লেখার মধ্যে থেকে যেতে পারে। অনেক সময় উপন্যাসের চরিত্রের নাম বদলে যায়। সম্পাদক এই ভুল শুধরে দিতে পারেন। সম্পাদনার সময় সম্পাদক এই ত্রুটি সংশোধন করে সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিবেশন করবেন। এই পরিমার্জনা যে একটি লেখাকে কতখানি সাহায্য করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘষে মেজে ঝকমকে করে গড়ে তুলতে সম্পাদনার কোন বিকল্প নেই।

প্রচ্ছদ বিন্যাসেও সম্পাদকের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। গ্রন্থের বিষয় ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রচ্ছদ তৈরি করতে হয়। একজন শিল্পী বিন্যাসের রূপরেখা তৈরি করেন। কিন্তু শিল্পীকে দিয়ে উৎকর্ষ মলাট তৈরি করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব সম্পাদকের। গ্রন্থটির দাবি শিল্পীকে বোঝাবেন তিনি। লেখকের ভাবনার সঙ্গে মলাট সৃজনকে মেলাবার দায়িত্ব বহন করেন সম্পাদক।

একই কথা অনেক সময় ঘুরে ফিরে চলে আসে। যে কোন রচনার পক্ষে তা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়। সজাগ সম্পাদক পুনরাবৃত্তি দেখলে সন্তর্পনে তা বাদ দিয়ে দেন। লেখক অজান্তে হয়তো পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। ছাপা হয়ে গেলে তা পাঠের পক্ষে হয়ে উঠবে বিরক্তিকর। সম্পাদক তাই সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন পুনরাবৃত্তির দোষ থেকে লেখাকে মুক্ত করতে। পুনরাবৃত্তি যদি না থাকে তাহলে লেখার উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী যে কোন বই-এর জন্যই সম্পাদনা প্রয়োজন। সম্পাদনার সময় যে পরিমার্জনা হয় তাতে একটি লেখা প্রকৃতভাবে মুদ্রণ উপযোগী হয়ে ওঠে। ছাপার মতো করে একটি গ্রন্থকে প্রস্তুত করার জন্যই দক্ষ সম্পাদক প্রয়োজন। একটি ভালো প্রকাশনা মানেই সেখানে রয়েছে সম্পাদকের সযত্ন প্রয়াস যা রচনাকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত করে তুলবে।

ভালো প্রকাশনা সংস্থা সর্বদাই দক্ষ সম্পাদক রাখার চেষ্টা করেন। বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা ফেবার অ্যান্ড ফেবারের সম্পাদক ছিলেন এলিয়ট। র‍্যানডম হাইসের সম্পাদক ছিলেন জর্জ মিলার। বাংলা প্রকাশনায় সিগনেট এক সময় খুবই হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। দিলীপকুমার গুপ্তের সযত্ন প্রয়াসে সিগনেট বাংলা প্রকাশনার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানে সম্পাদনার গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে লেখক নির্বাচনের কাজেও সম্পাদকরা শেষ কথা বলছেন। প্রকাশক যা চান সেটা লেখকের কাছ থেকে ঠিকঠাক নিয়ে আসাটাই সম্পাদকের কৃতিত্ব। তারপর সেই লেখাকে ঝকঝকে মুদ্রণে পরিণত করা পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব থাকছে।

১১৮.৭ সারাংশ

যে-কোনো ভাল উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ সম্পাদকের। অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছদ নির্মাণ থেকে মলাট, বাঁধাই পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের তদারক করেন তিনি। এমনকি অনেক সময় বিষয় নির্বাচনেও তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকে। লেখক তো সৃজন করেই ক্ষান্ত হন, কিন্তু ঐ সৃজনকে সার্থকভাবে গ্রন্থে রূপদান করতে সম্পাদকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সম্পাদকের কিছু কর্তব্য থাকে। এগুলি সম্পাদন করে তিনি একটি গ্রন্থের প্রকাশকে বাস্তবায়িত করেন। এই কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, নির্মাণ, পুনরাবৃত্তি, তথ্যগত ও মুদ্রণ প্রমাদ দূর করা, প্রচ্ছদ বিন্যাস, ও ছাপার কাজ তদারকি করা।

সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী যে কোন বই-এর জন্যই সম্পাদনা প্রয়োজন। যে প্রকাশনার দক্ষ সম্পাদক আছেন, সেই প্রকাশনার গ্রন্থও উৎকৃষ্টমানের হয়ে থাকে। ব্রিটেনের ফেবার ফেবার, আমাদের সিগনেটের গ্রন্থ সকলের মন সহজেই জয় করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ এই প্রকাশনা দুটি সম্পাদনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে যে কোন উন্নতমানের প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদকরাই গ্রন্থের রূপরেখা তৈরি করেন এবং তা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নেন।

১১৮.৮ অনুশীলনী—২

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) .... থেকে ...., ... মান, সজ্জা সবকিছুই সম্পাদনার মধ্যে পড়ে।

(খ) .... ও .... সমন্বয়ে, আকর্ষণীয় উৎকৃষ্ট .... করাই .... উদ্দেশ্য।

(গ) বিষয়ের .... সঙ্গে যেন .... ব্যবহারের .... থাকে।

২। গ্রন্থ সম্পাদনার গুরুত্ব কী? সম্পাদনা কি গ্রন্থ প্রকাশনার উৎকর্ষ বাড়ায়?

৩। সম্পাদকের কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি বর্ণনা করুন।

১১৮.৯ মূলপাঠ—৩ ঃ সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা

সংবাদপত্র সম্পাদনায় সম্পাদকের ভূমিকা প্রসঙ্গ প্রথম ও বর্তমান এককে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাঁর কর্মতৎপরতা, তাঁর দক্ষতা, দূরদৃষ্টি, সমাজ ও পাঠক মনস্তত্ত্ব জ্ঞান, ন্যস্ত দায়িত্ব সার্থকভাবে প্রতিপালনের সহায়ক। সংবাদপত্রের সমস্ত কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার দায় সেজন্য তাঁর ওপরই বর্তায়। কাগজে প্রকাশিত সমস্ত কিছুর জন্য তাঁকে আইনত দায়ী থাকতে হয়। বস্তুত সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রত্যক্ষতঃ জড়িত। তাই সংবাদপত্রের প্রচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্পাদকের গৌরব জড়িত থাকে।

সাময়কি পত্র—সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক—সংখ্যায় সংবাদপত্রের থেকে বিপুল হলেও, তার প্রতিটি এককের প্রচার সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সমাজে প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। বস্তুতঃ সাময়িক পত্রিকার কম থাকার কতকগুলি বাস্তব কারণও আছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রয় ক্ষমতার স্বল্পতা, দৈনিক পত্রিকা পাঠের পর সাময়িক পত্রিকা পাঠের প্রয়োজনীয়তা বোধের অভাবও অন্যতম হেতু। এক সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সাময়িক পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। বর্তমানের প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার বাৎসরিক সুমারিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার সংখ্যাগত পরিমাণ খুব নগণ্য নয়। প্রতি বৎসরই কিছু কিছু উৎসাহী তরুণ সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী ক্ষণজীবি মাসিক-ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এই সব প্রকাশনায় আত্মপ্রকাশের আবেগ যতটা আছে, নিষ্ঠা যতটা আছে, তুলনায় সাহিত্য শিল্পবোধ প্রায়শ অপ্রতুল।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বেশ কতকগুলি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল। যাঁরা চিন্তার জগতে কাব্য ভাবনায়, নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনুক্ত, এক্ষণ, কৃত্তিবাস, উত্তরসূরী, নতুন সাহিত্য, সুন্দরম্, সাহিত্যপত্র, পূর্বপত্র, কবি ও কবিতা, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', প্রবন্ধ পত্রিকা অন্যতম।

সেই সব বরেণ্য সম্পাদক-পরিচালকরা আজ অনেকেই নেই। তার স্থান অধিকার করেছে আশি-নব্বই-র দশক থেকে কতকগুলি 'বিশেষ সংখ্যা' নির্ভর পত্রিকা, যথা— 'কোরক', এবং 'যুমায়েরা', লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ধ্রুবপদ, কৌশিকী, চেতনা প্রভৃতি। এই সব পত্রিকার যাঁরা সম্পাদনা-পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সকলেই আধুনিক চিন্তাধারায় সম্পন্ন। চিন্তার জগতে নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধানে রত। এঁদের কোন কোন সংখ্যা প্রয়াত বা জীবিত লেখক-শিল্পী সম্পর্কে নিবিড় অনুসন্ধানী ও তথ্য সংগ্রহমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ গ্রন্থনায় গভীর মনোনিবেশে সমৃদ্ধ। সমস্যা হোল সাময়িক পত্রিকার জগতে এঁদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় প্রভাব প্রতিপত্তিও তুলনামূলকভাবে কম। প্রকাশনার সংখ্যা ও বাজার দখলের হিসেবে সাময়িক পত্রিকার স্টল অধিকার করে আছে কতকগুলি দৃষ্টি আকর্ষক উজ্জ্বল মলাটের ঝাঁ চকচকে পত্রিকা যারা মানে মর্যাদায় কোনদিক থেকেই স্থান পাবার যোগ্য নয়।

সাময়িক পত্র সম্পাদনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা শিল্পকলা—বিষয়ের বৈচিত্র্যে, উপস্থাপনার অভিনবত্বে, ভাষা শিল্পের সৌকর্যে এবং প্রয়োজনীয় উৎস নির্দেশে—নিবন্ধের গুরুত্ব বাড়ায়। ভাল সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনার জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের মতো সর্বতোমুখী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন না হলেও, সাময়িক পত্র সম্পাদনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্কতার সঙ্গে তাঁর মনন ও পত্রিকা প্রকাশের কৃৎকৌশল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রাখতেই হয়। সাময়িক পত্রিকা হোল জনৈক সাংবাদিকের ভাষায়—''সম্পাদকের একক প্রদর্শনী।" পক্ষান্তরে সংবাদপত্র যৌথ শিল্প—বহু ব্যক্তির সমবেত দক্ষ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিত্যদিনের সংবাদ পরিবেশিত হয়। কিন্তু সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক—পত্রিকার বিষয়বস্তু পরিকল্পনা থেকে লেখক নির্বাচন, সম্ভাবনাময় নতুন লেখক আবিষ্কার করে তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিয়ে নেওয়া, লেখার প্রয়োজনীয় সম্পাদনা মুদ্রণ-তদারকি, সহকারী না থাকলে প্রুফ সংশোধন, কাগজ নির্বাচন, অঙ্গসজ্জা পরিকল্পনা, লে-অফ ঠিক করা, প্রচ্ছদ ও ছবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া মায় বাঁধাই—সবই সম্পাদকের দায়িত্ব।

সংবাদপত্র থেকে সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধন বিশেষ গুরুত্ব দাবী করে। কেননা সংবাদপত্র একদিনের সাময়িক পত্রিকার নিবন্ধের আবেদন দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং প্রকাশিত, সাময়িক পত্রিকার কোন ভুলভ্রান্তির প্রতিক্রিয়াও দীর্ঘস্থায়ী এবং পত্রিকা প্রচারে বিঘ্ন ঘটায়। তাই প্রতিটি সংখ্যার জন্য সম্পাদককে বিশেষভাবে ভাবতে হয়। পাঠক পত্রিকা কেনেন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে। নতুন দৃষ্টিকোণে কোন বিষয় উপস্থাপিত হলে সেটি সাময়িকীর পাঠককে আকৃষ্ট করে। একটি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাই সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের বিরামের সুযোগ নেই। তাঁকে পরবর্তী সংখ্যার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কেননা সাময়িক পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সাময়িক পত্রিকা এখনও সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব-নির্ভর।

সাম্প্রতিক কালে সংবাদ-সাময়িকী'র প্রকাশ পত্রিকা সম্পাদনায় নতুন ধারার সংযোজন ঘটিয়েছে। এখানে এখন নানা ধরণের কর্মীর প্রয়োজন হয়। বার্তা সম্পাদকের প্রয়োজন না হলেও মুখ্য অবর-সম্পাদকের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে লেখার মধ্যে অভিনবত্ব ও চমক থাকে। সংবাদ-সাময়িকীতে দরকার হয় কতিপয় চিত্রশিল্পী ও একজন শিল্প নির্দেশক, দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ। এই পত্রিকার প্রচ্ছদ নিবন্ধ অন্তরতদন্তমূলক চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে আকর্ষণীয়। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় তদনুসারী। নতুন প্রজাতির এই সাময়িকীর আবেদন দিনান্তেই বিস্তৃত যোগ্য।

পরিশেষে সাময়িকী সম্পাদনার আলোচনা উপসংহারে নির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে —

(১) সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের 'বহু' পূর্বেই সম্পাদক সম্ভাব্য সংখ্যাগুলির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লেখকসূচী নির্দ্দিষ্ট করে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন।

(২) সম্পাদক তাঁর সৃজনি শক্তি ও কল্পনার সাহায্যে নতুন নতুন আলোচনার বিষয়বস্তুর উদ্ভাবন করবেন।

(৩) নতুন লেখক তৈরি করা এবং তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে তাঁদের দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করা।

(৪) সাময়িক সম্পাদকের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, ভাষা, প্রকাশ ভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা সবিশেষে গুরুত্বপূর্ণ।

১১৮.১০ সারাংশ

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনায় পার্থক্য আছে। সংবাদপত্র প্রকাশনায় থাকে একটি সামগ্রিক উদ্যোগ। তাই সংবাদপত্র সম্পাদককে একজন দক্ষ প্রশাসক হতে হয়। সাময়িকপত্রের সম্পাদক একাই সব। পত্রিকার সম্ভাব্য সংখ্যাগুলি সম্পর্কে সময় থাকতে পরিকল্পনা রচনা, সম্ভাব্য লেখকসূচী স্থির করা, মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা পরিকল্পনা সবই সম্পাদকের একার ওপর নির্ভরশীল।

সাময়িক-সম্পাদক হবেন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি বোধসম্পন্ন। তাঁকে সম্পাদনায় সাহায্য করবার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একজন সুযোগ্য সহকারী দরকার, অন্যথায় পত্রিকা হয়ে ওঠে সম্পাদকের 'একক প্রদর্শনী' বিশেষ। অতি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে নিরঙ্কুশ সাহিত্য-বিজ্ঞানের পরিবর্তে 'সংবাদ-সাময়িকী' প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলি সমসাময়িক ঘটনা নির্ভর সাময়িক পত্রিকা—সংবাদ-সাময়িকী। এখানে বিশেষভাবে সাংবাদিক সম্পাদকদের প্রাধান্য।

১১৮.১১ অনুশীলনী—৩

১। সংবাদপত্র অপেক্ষা সাময়িক পত্রিকার সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও সাময়িক পত্রিকা প্রচারের স্বল্পতার কারণ সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

২। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের স্মরণীয় ৫ (পাঁচটি) পত্রিকার নাম উল্লেখ করুন।

৩। সাময়িকপত্র সম্পাদনায় সম্পাদকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। সাময়িক পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তাঁর কী কী গুণাবলী থাকা প্রয়োজন আলোচনা করুন।

১১৮.১২ মূলপাঠ—৪ ঃ প্রুফরিডিং

প্রুফরিডিং ঃ যে কোন রচনাকে নিখুঁত করে গড়ে তুলতে প্রুফরিডিং দারুণভাবে সাহায্য করে। কোন রচনা কম্পোজ হবার পরে প্রথম ছাপা তোলা হয় কাগজে। একে বলে গ্যালি প্রুফ। এক কলামে ছাপা এই প্রুফ মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন প্রক্রিয়ার নাম প্রুফ রিডিং। মূল রচনায় যা আছে কম্পোজ করার পর প্রথম ছাপায় তা হুবহু থাকে না। প্রচুর ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। এগুলো প্রুফরিডিং-এর সময় সংশোধন করা হয়। যিনি প্রুফরিডিং করেন তাঁকে বলা হয় প্রুফরিডার। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও গ্রন্থ প্রকাশনায় প্রুফরিডারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে মূল রচনার সঙ্গে গ্যালি প্রুফ মিলিয়ে যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করে দেন। এই সংশোধন মুদ্রিত রচনার পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যানডার্ড প্রুফ রিডিংয়ের কতকগুলি সাধারণ সূত্র ও বিধি দিয়েছেন যা মেনে চললে দেশের সমস্ত প্রকাশনার ত্রুটি সংশোধনে এক ধরনের সমতা আসবে। বি আই এস-এর নির্দেশ মতো পাঁচটি বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলি হল— (১) বিষয়গত ত্রুটি (text), (২) যতিচিহ্ন (punctuation), (৩) স্থানের নির্দেশ (spacing), (৪) সমতা (alignment) এবং (৫) হরফ (type)।

প্রুফরিডারের কাজ ঃ খুব সতর্কভাবে মূল পাঠের সঙ্গে গ্যালি প্রুফকে মিলিয়ে দেখতে হবে। মূল পাঠে যা আছে তা অনুসরণ করে প্রুফে যদি কোন ভুল থাকে তাহলে তা সংশোধন করবেন প্রুফরিডার।

প্রথমেই তিনি বানান ভুল সংশোধন করবেন। কম্পোজ করা ম্যাটারে প্রচুর বানান ভুল থাকে।

সেগুলি সংশোধন করতে হয়। একই বইতে অথবা সংবাদপত্রে এক বানান রীতি মেনে চলা দরকার। 'সরকারি' বানান সর্বত্রই একই রকম হওয়া উচিৎ। এক জায়গায় হ্রস্ব ইকার, আরেক জায়গায় দীর্ঘ ঈ-কার দেওয়া উচিৎ নয়।

দ্বিতীয়ত, অক্ষর অনেক সময় উলটে যায়। যেমন ন উলটে এইরকম ছাপা হল, তখন উলটে যাওয়া 'ন'কে ঠিক করে দিতে হবে। অতিরিক্ত কোন অক্ষর যদি ছাপা হয় তাহলে তা বাদ দিতে হবে।

তৃতীয়ত একটি শব্দের মধ্যে অনেকসময় ফাঁক থেকে যায়, তখন তা দূর করে কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। সংবাদ পত্র, এরকম থাকলে তা করতে হবে সংবাদপত্র। ঠিক একইভাবে যেখানে ফাঁক থাকা দরকার। সেখানে যদি তা না থাকে তাহলে তা বসাতে হবে। যেমন—'বামফ্রন্টসরকার' হবে 'বামফ্রন্ট সরকার'।

চতুর্থত মূল পাঠের কিছু অংশ বাদ যেতে পারে গ্যালি প্রুফে। কম্পোজিটর ভুল করে হয়তো কিছু অংশ বাদ দিয়ে কম্পোজ করেছে। তখন বাদ দেওয়া অংশকে পুনরায় সংযোজিত করতে হবে।

পঞ্চমত ঠিকঠাকভাবে অনুচ্ছেদ বসাতে হবে। অনেক সময় অনুচ্ছেদের ওলোট পালোট হয়ে যায়, তখন তা সঠিক জায়গায় বসাতে হয়।

ষষ্ঠত, তারিখ, সালের ও নামের ভুল থাকলে প্রুফরিডিং-এর সময় তা সংশোধন করে ঠিক করা হয়। প্রুফরিডিং হল শেষ চেক পয়েন্ট। ভুল শোধরাবার শেষ জায়গা।

প্রুফ সংশোধনের চিহ্ন ঃ প্রুফ দেখার সময় মার্জিনের সাদা জায়গায় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়। অফসেট ছাপায় কমপক্ষে দু'বার প্রুফ দেখতে হয়। প্রথম প্রুফ দেখার সময় যে রঙের কালি ব্যবহার করা হয়, দ্বিতীয় প্রুফ দেখার সময় অন্য রঙের কালি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

হরফ বদল করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে / এইরকম চিহ্ন দিয়ে মার্জিনে / এই চিহ্ন দিয়ে যে বদলি হরফ চাওয়া হচ্ছে সেটা লিখে দিলেই হবে। যেমন শব্দে 'ন' পাল্টে ল আনতে হবে। মার্জিনে / ল এইভাবে লিখলেই কম্পোজিটার বুঝতে পারবেন প্রুফরিডার কী পরিবর্তন চাইছেন। একটি শব্দ যদি ভুল করে আলাদা হয়ে যায় তাহলে / চিহ্ন দিয়ে তারপর মার্জিনে এই চিহ্ন দিলেই হবে। হরফ ওলোট পালোট হলে মূল পাঠেই বসাতে হবে এই চিহ্ন। কোন হরফ বা শবব্দ বাদ দিতে গেলে / এই চিহ্ন দিয়ে মার্জিনে চিহ্ন d দিতে হবে। এইরকম অসংখ্য চিহ্ন আছে যা প্রুফ রিডাররা কাজের সময় প্রয়োগ করেন সঠিক জায়গায় এবং এই চিহ্ন দিয়ে কম্পোজিটারকে বুঝিয়ে দেন কাঙ্খিত পরিবর্তনটি কী হবে।

১১৮.১৩ সারাংশ

ছাপা রচনায় যাতে কোন ভুল না থাকে তার জন্য দরকার প্রুফ রিডিংয়ের। কাজটি করেন প্রুফরিডার, মূল পাঠের সঙ্গে গ্যালি প্রুফকে মিলিয়ে তিনি প্রুফ দেখেন। বানান ভুল, তথ্যগত ত্রুটি, হরফের ওলোট-পালোট, সবকিছুই সংশোধন করা হয়। বিশেষ কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে তিনি এই প্রুফ সংশোধন করেন। যে কোন ছাপা রচনাকে ত্রুটি মুক্ত ও নিখুঁত করে তুলতে প্রুফের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১১৮.১৪ অনুশীলনী—৪

১। প্রুফ সংশোধন কেন প্রয়োজনীয়? সংক্ষেপে লিখুন।

২। প্রুফ কে সংশোধন করেন? প্রুফ দেখায় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের উপযোগিতা কী?

১১৮.১৫ উত্তর-সংকেত (অনুশীলনী (মূলপাঠ—১, ২, ৩ ৪)

অনুশীলনী—১

১। (ক) ক্লাস এইট, সংবাদপত্র।

১১৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

অনুশীলনী—১

১। (ক) সম্পাদকীয় কে, কণ্ঠস্বর।

(খ) সমসাময়িক, ঘটনা, বিষয়ের।

(গ) সক্রিয়, প্রতিবাদ, সম্পাদকীয়ের।

২। সম্পাদকীয় লেখককে 'লিডার রাইটার' বলার কারণ তিনি সমসাময়িক যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঘটনাটির সম্ভাব্য কারণ, জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে কাগজে মতামত দেন। এর ফলে এটি জনমত তৈরি করতে সাহায্য করে।

৩। সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি 'সম্পাদকীয়' শীর্ষক আলোচনায় যে দুটি সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে, তার সারাংশ উপস্থাপিত করুন।

অনুশীলনী—২

১। (ক) মলাট, বাঁধাই, ছাপার, সজ্জা।

(খ) রুচি, উপযোগিতা, গ্রন্থপ্রকাশ, সম্পাদনার।

(গ) প্রাসঙ্গিকতার, অনুচ্ছেদ, সাযুজ্য।

২। 'গ্রন্থ সম্পাদনা' অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। 'সম্পাদকের কর্তব্য' শীর্ষক অংশ পড়ে উত্তর দিন।

অনুশীলনী—৩

১। মূলপাঠ—৩-এর অর্ন্তগত, সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা' প্রসঙ্গ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেন।

২। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের পাঁচটি পত্রিকা ঃ অনুক্ত, এক্ষণ, কৃত্তিবাস, উত্তরসূরী, নতুন সাহিত্য।

৩। সাময়িকপত্র সম্পাদকের ভূমিকা মূলপাঠ—৩-এর শেষাংশ অবলম্বনে উত্তর করুন।

৪। মূলপাঠ—৩ অবলম্বনে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

অনুশীলনী—৪

দুটি প্রশ্নেরই প্রাসঙ্গিক উত্তর মূলপাঠ—৪ অবলম্বনে তৈরি করুন।

১১৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Editor on Editing –*NBT Publication.*

২। M. V. Kamath –*Professional Journalism.*

৩। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় — *সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রভাবনা — বিষয় সাংবাদিকতা।*

ই. বি. জি—৮

বাংলা বিষয়ের

ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়

৩৩

একক ১১৯ ❑ সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ ও প্রতিবেদন রচনার প্রস্তুতি

গঠন

১১৯.১ উদ্দেশ্য

১১৯.২ প্রস্তাবনা

১১৯.৩ মূলপাঠ

১১৯.৪ সারাংশ

১১৯.৫ অনুশীলনী

১১৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন। তাহলে—

- একালের একটি আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক পেশা যে সাংবাদিকতা তার একটি রূপরেখা সম্বন্ধে আপনার মনে একটি ধারণা গড়ে উঠবে।
- সাংবাদিকতার নানা স্তর, নানা দিক আছে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল রিপোর্ট তৈরি বা প্রতিবেদন রচনা। সেই প্রতিবেদন কীভাবে লিখতে হয় বা তৈরি করতে হয় তা আপনি এখানে জানতে পারবেন। শিখতে পারবেন বুঝতে তো পারবেনই, আর নিজে নিজেই তা লিখতে পারবেন কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত করে পাঠাতে পারবেন।
- প্রত্যেক দিন সংবাদপত্রে মুদ্রিত আকারে আমরা যা যা পড়ি তার একটি অংশ হল প্রতিবেদন। সেই প্রতিবেদনের নিজস্ব যে রূপ ও রীতি আছে তা আপনি এখানে দেখতে পাবেন এবং হাতে-কলমে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের ভাষা একটু আলাদা ধাঁচের হয়। তার ভঙ্গি, স্বাদ অন্যান্য সাহিত্যিক বা ব্যবহারিক গদ্যরচনা থেকে স্বভাবে, মর্জিতে বা মেজাজে খানিকটা আলাদা। সেই ভাষাভঙ্গিটি আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন।

- খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রতিবেদন রচনার সঙ্গে বেতার, দূরদর্শন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচারের জন্য প্রতিবেদন রচনার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তফাত রয়েছে মুদ্রণ মাধ্যমের সঙ্গে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের। এক জায়গায় পাঠক নিজেই মনে মনে খবরটি পড়েন, কখনো কখনো আড্ডার ভিতর বড়ো জোর দু-একজনকে পড়ে শোনান, আর অন্য গণমাধ্যমগুলোয় শ্রোতারা শোনেন, দর্শকেরা শ্রবণ-দর্শনের মেলবন্ধন ঘটান, গ্রাহকেরা গ্রহণ করেন। তাই মাধ্যম বা মিডিয়ার কারণেই প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে কীভাবে পার্থক্য ঘটে যায় বা তফাতটি করতে হয়, সেই বিষয়টাও আপনি এখানে জানতে পারবেন, রপ্ত করে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- সাময়িক পত্র, জার্নাল ইত্যাদির জন্য প্রতিবেদন রচনা আবার স্বতন্ত্র ধরনের। সেই স্বাতন্ত্র্য কোথায়, তা কীভাবে রক্ষা করতে হয় তা-ও আপনি জানতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব ইত্যাদি কোনো প্রতিষ্ঠানের মাসান্তিক, দ্বিমাসিক, ত্রিমাসিক, চতুর্মাসিক, ষান্মাষিক, বার্ষিক প্রতিবেদন রচনা, আবার কোনো গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য বা প্রকাশার্থে তৈরি প্রতিবেদন যে গুণগত, ভঙ্গিগত দিক থেকেও আলাদা তা আপনি সহজেই এখানে বুঝতে বা জানতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন কীভাবে যুক্তি-তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে লিখতে হয় সেই পদ্ধতিটি আপনি এখানে খুঁজে নিতে পারবেন।

১১৯.২ প্রস্তাবনা

এ যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। এ যুগ বিশ্বব্যাপী বার্তা-বিনিময় ও প্রচারের প্রসারিত কাল। সংবাদ জানার অধিকার একালের সকলের অধিকার। ঘরের খবর, বাইরের খবর, দেশের খবর, দশের খবর—সব খবরেই মানুষের বরাবর আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা। শুধু তাই নয়, আঁতের খবর, হাঁড়ির খবর, এমন কী খবর ছাড়িয়ে খবর, খবরের ভিতরের খবরও টেনে বের করাই সাংবাদিকের কাজ। তাঁরা চান পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের হরেকরকম চাহিদা মেটাতে। চান টক-ঝাল-নোনতা-মিষ্টির মিশেল দিয়ে কৌতূহল উস্কে দিতে, নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বাড়িয়ে বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে, বাজার দখল করতে। অথবা চান আদর্শের বিস্তার; চান সংগ্রামের ভিত আরো মজবুত করতে, সংগঠনের বৃদ্ধিও। চান শাসন ক্ষমতা দখলে রাখতে বা দখল করতে। সোজা সাপ্টা ব্যাপার হল, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে খবরের দুনিয়ায় নিরন্তর প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রত্যেকটি সংবাদ-প্রতিষ্ঠানই চায় টিকে থাকতে, চায় বিপণনের বৃদ্ধি, আধিপত্যের বিস্তার।

মুদ্রণ মাধ্যমেই হোক আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই হোক গণমাধ্যম হল বিশ্বের বাতায়ন। এ হল সেই খোলা দরজা-জানালা যার মধ্য দিয়ে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকেরা পান চলমান পৃথিবীর রোজকার টাটকা বাতাস, সঞ্জীবনী আলো। এর মাধ্যমেই তাঁরা প্রতিদিনই নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করেন, তথ্যসমৃদ্ধ করেন, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটান, গভীরতা বাড়ান। তাঁরা থাকেন সংবাদ-সম্পদে তরতাজা, চলতে থাকেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। আর তাঁদের কর্মকুশলতায় পাঠক-দর্শকেরা তাঁদের সংবাদ বুভুক্ষা মেটান। বার্তাজীবীদের আনকূল্যেই সংবাদপত্র বিশ্বের দর্পণ, বেতার বিশ্বব্যাপী বাণী, দূরদর্শন সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তের দর্শন-শ্রবণের চলমান শৈল্পিক সমাহার।

১১৯.৩ মূলপাঠ

সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের কাছে একটি চিত্তাকর্ষক পাঠ্যক্রম। আবার তা ব্যবহারিক জীবনে অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এক আকর্ষণীয় পেশা। সামাজিক মর্যাদায় তা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রামের শানানো হাতিয়ার হল সাংবাদিকতা। অন্যান্য অনেক পাঠ্যবিষয়ের মতো শ্রেণিকক্ষে ভাষণ দানের মধ্যে সাংবাদিকতায় পাঠদান শেষ হয় না, তা মুখস্থবিদ্যার নিষ্ফল প্রদর্শনীও নয়। এ হল হাতে-কলমে করে দেখানোর বিষয়। এর প্রায়োগিক দিকটাই অধিকতর মূল্যবান। জরুরিও বটে।

বলাই বাহুল্য, জন্মসূত্রে কেউ সাংবাদিক হন না। স্বভাব-সাংবাদিক বলেও কিছু হয় না। সাংবাদিক হতে গেলে তাঁকে সব ব্যাপারে কৌতূহলী হতে হয়, সজাগ থাকতে হয়, চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। তাঁকে প্রতিনিয়তই শিক্ষা নিতে হয় বিশ্বজোড়া ঘটনাপ্রবাহ থেকে। নিজের সমাজকে, দেশকে, জনজীবনকে চিনতে হয় গভীর মমতায়, সংবেদনশীলতায়। ভাবতে হয় সমাজের স্বার্থে, মানুষের মঙ্গলে কীভাবে সাংবাদিকতাকে আরো চাঁচাছোলাভাবে ব্যবহার করা যায়। সমাজে নানামুখী চিন্তার ঝোঁক, কর্মের স্রোত পর্যবেক্ষণ করতে হয় সাংবাদিককে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। বাস্তবিকই, সমাজজীবনের পাঠশালা থেকে যেমন তাঁকে শিক্ষা নিতে হয় তেমনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক পাঠ্যবিষয় হল সাংবাদিকতা। এ বিষয়টি যথার্থই নিয়মিত অধ্যয়ন-অনুশীলনের দাবি রাখে। তত্ত্ব ও তথ্যগত দিক থেকে সাংবাদিককে সমৃদ্ধ হতে হয়। জানতে হয় তাঁকে সাংবাদিকতার ইতিহাস, দেশ-বিদেশের খ্যাতকীর্তি গণমাধ্যমগুলির স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে গণমাধ্যমের গুরুত্ব ও ভূমিকা, মুদ্রণ মাধ্যমগুলির পরিচালন ব্যবস্থা-প্রচার-পরিবেশনের পদ্ধতি, বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির অবদান-চরিত্র-বিশেষত্ব, সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন বিশ্বব্যক্তিত্ব ও তাঁদের কর্ম-চিন্তা-কৃতিত্ব, সাংবাদিকতার নানা সংরূপ বা জেনর্, বিভিন্ন শ্রেণি-পর্যায় ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য কর্মপদ্ধতি-চরিত্র-প্রভাবের পার্থক্য সত্ত্বেও কমবেশি প্রত্যেকটি গণমাধ্যম বা সংবাদপত্র-টি.ভি.-রেডিওয় কর্মীদের মধ্যে মোটামুটিভাবে দুটি ভাগ দেখা যায়। একদিকে সম্পাদনার বিষয়সমূহ অন্যদিকে ব্যবস্থাপনার ব্যাপার-স্যাপার। একদিকে সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, সহ-সম্পাদক অবর সম্পাদকদের নিয়ে সম্পাদকীয় বিভাগ, অন্যদিকে বার্তা সম্পাদক, উপ-বার্তা সম্পাদক, সহ-বার্তা সম্পাদক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, বিশেষ প্রতিনিধি, ফোটোগ্রাফার, সংবাদলেখক, অনুবাদক, চিত্র সাংবাদিক, প্রুফ সংশোধক প্রমুখ নিয়ে বার্তা বিভাগ। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ার, কারিগরি ব্যক্তিত্ব, অর্থ-উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপন অধিকর্তা, গ্রন্থাগারিক, গবেষণাকর্মী, প্রচার অধিকর্তা, পরিবেশক প্রমুখ নিয়ে বিরাট সংখ্যক অবার্তাজীবী।

পেশা হিসাবে সাংবাদিকতার আলাদা বাড়তি আকর্ষণ আছে। রয়েছে তার ভিতরে চটক, চমক, চমৎকারিত্ব। সর্বোপরি আছে জীবনের প্রতি অঙ্গীকার, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, বৃত্তির প্রতি নৈতিক নিষ্ঠা—এক কথায় পেশাদারিত্ব।

সাংবাদিক হিসেবে কেউ কেউ পছন্দ করেন ডেস্কে বসে দপ্তরের হিমেল আবেশে বা যন্ত্রের মায়াবী গুঞ্জন ও নিম্নস্বর শতকণ্ঠের সম্মিলিত পরিমণ্ডলে লেখনীটিকে সচল রাখতে। অত্যন্ত দ্রুততায় নব নব সৃষ্টিতে ভাষান্তরে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জনে ব্যস্ত থাকে তাঁদের কলম, টান-টান থাকে মন ও মনন। বেরিয়ে আসে সম্পাদকীয় নিবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, কলম রচনা, চিঠিপত্র, সম্পাদকীয় টিপ্পনী, নিউজ এজেন্সির পাঠানো সংবাদটিকে প্রতিষ্ঠানের চরিত্রানুযায়ী গড়ে তোলা ইত্যাদি। কখনও কখনও প্রতিবেদকের পাঠানো প্রতিবেদনটির ঘষামাজা করে নতুন করেও লিখে নিতে হয়। আবার অনেক সাংবাদিকই দপ্তরে বসে কাজ করতে ভালোবাসেন না। এঁরা চান বাইরের জগত থেকে, ঘটনাপ্রবাহ থেকে, সভা-সমাবেশ-আলোচনা-বিতর্ক থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মধ্যে নিজস্ব ঢঙে পরিবেশন করতে। এঁরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি চনমনে হন, গোপন খবরের জন্য ছোঁক ছোঁক করেন, দরকারে গোয়েন্দা পুলিশের মতো সোর্স-কে কাজে লাগান, স্বাদ নেন সাংবাদিকতা পেশাটির ভিতরকার রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চারিজম। এঁরা গোপন খবর বের করে পান আবিষ্কারের আনন্দ, ঝুঁকি নিয়েই খুঁজে পান সাংবাদিকতার বর্ণময়তা। এঁরা রিপোর্ট বা প্রতিবেদন দানের মধ্যে নিজেদের মগ্ন রাখতে ভালোবাসেন। খরা-বন্যা-মারী-যুদ্ধ-সন্ত্রাস থেকে রাজনৈতিক ঘটনা ও আন্দোলন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক বিতর্ক, খেলাধুলো, বিজ্ঞান, শিক্ষা, আইন-আদালত এঁদের ভীষণভাবে টানে। যেখানেই খবরের সম্ভাবনা সেখানেই হাজির হন এঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের স্বার্থে। নিজস্ব প্রতিবেদন নিয়ে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে প্রতিবেদকে প্রতিবেদকে চলে অনেক সময় সযত্নে রক্ষিত গুপ্ত প্রতিযোগিতাও। এরকম প্রতিবেদনই পাঠক-শ্রোত-দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন তোলে, সাড়া জাগায়, চাঞ্চল্য আনে। বিতর্ক উস্কে দেয়, আলোচনার ঝড় ওঠে, সংবাদ প্রতিষ্ঠানের অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাস্তবিকই, সাংবাদিকতার আসল মেজাজটি পাওয়া যায়, অনেকের মতে, প্রতিবেদন পেশ করার মধ্যে। প্রতিবেদকের স্মার্টনেস, খবরের ভিতর থেকে খবর বের করে নেবার কুশলতা, সংবাদপত্রই শুধু নয় টি.ভি., রেডিও ইত্যাদিরও সম্পদ। তবে একথাও যেন আমরা ভুলে না যাই যে গণমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন কোনো খাপছাড়া বিষয় নয়। সাংবাদিকতায় কোনটাই খাপছাড়া জিনিস হয় না। সব কিছুর মধ্যেই থাকে এক ধরনের সঙ্গতি। ঐকতানের আমেজ। এমন কী সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ যে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন রচনা, তা পেশ বা সম্প্রচার করা, তাকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যহীন বা নৈমিত্তিক ব্যাপার বলাও ঠিক হবে না। সোজা কথায় সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ছাপানোটাকে যদি কেউ মনে করেন মাঝে-মাঝে ঘটে যাওয়া ব্যাপার-স্যাপার তাহলে বিসমিল্লাতেই গলদ থেকে যাবে। রিপোর্টের যে আলাদা গুরুত্ব আছে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সেটাকে অস্বীকার করা মানে সংবাদপত্রকে কতগুলি ছাপানো অক্ষর ও ছবির ঝুড়িতে টেনে নামানো। কিংবা বলা যায়, তা করলে সংবাদপত্রকে জোলো করে ফেলা হবে, আকর্ষণ, চাহিদা কিছুই থাকবে না পাঠকের কাছে। এতে ব্যবসা মার খাবে। আর সংবাদপত্রকে যাঁরা আদর্শগত সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান সেটাও নষ্ট হবে। তা যাতে না হয় অর্থাৎ সংবাদপত্র যাতে বেশি বেশি করে পাঠক আকর্ষণ করতে পারে, তাঁদের সংগঠিত, শিক্ষিত, উদ্দীপিত করতে সক্ষম হয়, টাটকা তাজা খবর গরম গরম পরিবেশন করতে পারে সেজন্য প্রতিবেদনের রয়েছে ব্যাপক-গভীর সোচ্চার ভূমিকা। কাজে কাজেই, নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাটা সংবাদপত্রের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারই অর্ন্তগত। এই ধরনের লেখার মধ্যে রয়েছে উঁচু মানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত গুরুত্ব।

কিন্তু রিপোর্টটা আপনি লিখবেন কেমন করে? প্রতিবেদন রচনার জন্য আপনি কীভাবে জোগাড় করবেন তার উপকরণ, মাল-মশলা? প্রস্তুতিই বা নেবেন কীভাবে? ধরুন আপনাকে কোনো একটি ঘটনার ওপর প্রতিবেদন তৈরি করতে বলা হয়েছে। বলা তো হল, কিন্তু আপনি কীভাবে এগোবেন আরোপিত কর্তব্যটি সম্পাদন করতে?

সাংবাদিক হিসাবে আপনার ওপর দায়িত্ব বর্তানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ঘটনাটির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করবেন। রিপোর্টটি সুষ্ঠুভাবে লেখার জন্য আপনি যা যা দরকারি বলে মনে করবেন তা জোগাড় করতে উঠে পড়ে লাগবেন বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। মনে রাখবেন রিপোর্টাররা হন খুব চালাকচতুর, সতর্ক, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ও রসিক। বাক্-বৈদগ্ধ্য তাঁদের স্বভাবের কবচকুণ্ডল। চোখ-কান সবসময়ে খোলা রাখতে হয় প্রতিবেদককে। আবার কখনো কখনো তাঁদের গবেষকদের দায়িত্বও পালন করতে হয়।

ধরা যাক যে ঘটনার ওপর প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব পেয়েছেন সেই ঘটনার ওপর ইতোমধ্যেই নিউজ এজেন্সি থেকে সংবাদ এসে গিয়েছে আপনার পত্রিকা দপ্তরে। কিন্তু আপনার বিবেচনায় মনে হল প্রেরিত তথ্য যথেষ্ট নয়। এবার শুরু হল রিপোর্টার হিসাবে আপনার অভিযান। পুলিশ থেকে শুরু করে যাবতীয় নির্দিষ্ট সূত্র থেকেও আপনি জোগাড় করলেন অতিরিক্ত কিছু তথ্য। তাতেও আপনার মনে হল পাঠকের কৌতূহল বজায় রেখেও তাঁদের চাহিদা মেটানোর মতো রশদ নেই। সম্ভব হলে নিজেই এবার যাবেন ঘটনাস্থলে। ঘটনাস্থলে যা যা দেখলেন সেগুলোও আপনার প্রতিবেদক-দৃষ্টিকে খুশি করতে পারছে না। বারবার মনে হচ্ছে শাদা চোখে ঘটনাটার যা যা দেখছেন, শুনছেন, জানতে পারছেন, সেখানেও কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে। মন বলছে, ডাল মে কুছ্ কালা হ্যায়। আপনার মন তখন আতালি-পাতালি করছে, গোয়েন্দা কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে সব কিছুতেই আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ঘটনার ভিতর থেকে বের করে আনতে চাইছে গোপন তথ্য, আসল সত্য।

এসব ক্ষেত্রে নানা জনের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে। একের পর এক খুব কৌশলী, সতর্ক প্রশ্ন করে বুঝবার চেষ্টা করবেন ব্যাপারটা কী। এজন্য প্রতিবেদক হিসাবে সুন্দর সুন্দর কথা বলার আর্ট আপনাকে রপ্ত করতে হবে। এভাবে নানা দিক থেকে যে মালমশলা আপনি পাবেন তা থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে, দরকার মতো যুক্তিসিদ্ধ তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তৈরি করবেন আপনার পত্রিকার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিবেদনটি। খেয়াল রাখবেন পরিমাণের সঙ্গে যেন উৎকর্ষের মেলবন্ধন ঘটে। বিষয় অনুযায়ী ভাষাশৈলীর সংহতিসাধন করবেন। কল্পনার উদ্দামতা, আবেগের আতিশয্য অবশ্যই ছেঁটে ফেলবেন প্রতিবেদন থেকে। তাই বলে ভাষা যেন কাঠ-কাঠ না হয়। গদ্য হবে ঝরঝরে, মেদবর্জিত। কারো ওপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করবেন না সন্দেহবশত, কিংবা অদৃশ্য ব্যক্তির হয়ে কাজ করবেন না। অনুমানের ওপর ভরসা করে প্রতিবেদনকে একপেশে করে তোলাও সাংবাদিকের কাজ নয়। আর যখন দেখবেন নানা ধরনের গোলমেলে বা বিপরীতধর্মী তথ্য পাচ্ছেন তখন প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যাচাই করে নেবেন ক্রশ চেকিং করে। তারপর নিজের বিবেচনামতো ঠিক করে ফেলবেন কী কী রাখবেন, কতটুকু রাখবেন এবং কেন রাখবেন। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের স্বার্থ, তার চরিত্র ও লক্ষ্যকে অবশ্যই বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

তাহলে গণমাধ্যমের জন্য প্রতিবেদন লিখতে গেলে আপনি কীভাবে এগোবেন? এক কথায় এর কোনো জবাব হয় না। নেই কোনো বাঁধা গৎ-ও। তবে আপনি ইচ্ছে করলে নিচে উল্লিখিত উপায়গুলি একবার ভেবে দেখতে পারেন। অর্থাৎ আপনাকে জানতে হবে—

- ঘটনার প্রকৃতি বা বিষয়টি কী ধরনের।

- কী অবস্থায় কী কারণে কেমনভাবে ঘটনাটা ঘটল। এক্ষেত্রে ভেবে-চিন্তে এগোবেন, মুহূর্তের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।

- বিষয়টির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমস্যাটা কী তা বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই করতে হবে, সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় তার ইঙ্গিত পারলে যোগাড় করবেন এবং এটা করতে পারেন বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ যাঁকে যাঁকে হাতের কাছে পাবেন তাঁদের থেকে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক হিসাবে আপনি বিষয় অনুসারে এমন কিছু লোক বাছাই করে নেবেন যাঁদের সঙ্গে কথা বললে আপনি বেশ কিছু তথ্য পেতে পারেন। এজন্য গণসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারি আমলা, পুলিশ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন—

  (i) সমস্যা বা বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে এমন ব্যক্তিটি কে বা কারা?

  (ii) তাঁদের মধ্যে আবার বিষয়টি সম্পর্কে কার জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ?

  (iii) সমস্যার সুরাহার পথ কে বাতলে দিতে পারেন?

একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, অনেক সময় নোট নিতে গেলে বিপত্তি ঘটতে পারে। অর্থাৎ সাংবাদিক নোট নিচ্ছেন দেখলে উত্তরদাতা গুটিয়ে যেতে পারেন, খোলামেলা আলোচনা না-ও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য স্মৃতিতে ধরে রাখবেন উত্তর, তাঁর সামনে কিছুই লিখবনে না। বরং তাঁর সঙ্গে মিশবার, কথা বলবার চেষ্টা করবেন বন্ধুর মতো বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

- সব কিছু জানা-শোনা-বোঝার পর নিজের ক্ষমতা যাচাই করে ঠিক করে নেবেন ব্যাপারটা প্রতিবেদন রচনার উপযোগী কিনা।

- প্রতিবেদনে আপনি ঘটনা বা বিষয়টির কোন্ দিকের ওপর ঝোঁক দেবেন বেশি সেটাও ঠিক করে নেবেন। এক্ষেত্রে আপনি নিজেকেই নিজে কিছু প্রশ্ন করে মনে মনে জবাব তৈরি করে নিতে পারেন। তা হল,

  (i) আমার প্রতিবেদনের কোন্ অংশ পাঠক-দর্শক শ্রোতাকে বেশি নাড়া দেবে, উন্নতি ঘটাবে, চেতনা বাড়াবে?

  (ii) কোন্ মানসিকতা কাজ করেছিল ঘটনাটার মূলে?

  (iii) ঘটনা ঘটার কারণ যা যা তা জানানো হলে পাঠকের-দর্শকের-শ্রোতাদের কী প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে?

  (iv) ঘটনাটা পাঠকের কাছে কোন্ বার্তা পৌঁছে দেবে?

- ঘটনা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি আপনার জানা থাকা জরুরি।
- মূল প্রশ্নটির উত্তর বিশদভাবে আপনি জানবার চেষ্টা করবেন।

একের পর এক সমস্ত বা অধিকাংশ জিজ্ঞাসারই যখন জবাব আপনি হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন তখনই লিখতে শুরু করবেন নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিবেদনটি। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই খুব দ্রুত সেরে ফেলবেন। রয়ে-সয়ে দেখছি-দেখব করে সময় কাটালে রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা যে ফুরিয়ে যায় সেটা কিন্তু খেয়ালে রাখবেন। রিপোর্ট হল গণমাধ্যমের চট্‌জলদি তৈরি খাবার।

এরপর সমস্ত উপকরণ নিয়ে আপনি একে একে নিচের প্রশ্নের উত্তর দেবেন আপনার লেখা প্রতিবেদনটিতে। অবশ্য নিউজ আইটেমের ক্ষেত্রেও এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হয় সাংবাদিককে। প্রশ্নগুলি হল,

- কে বা কারা?
- কবে, কখন, কোথায়?
- কী
- কীভাবে?
- কেন?
- কীসের জন্য?

প্রতিবেদন তৈরির সময়ে প্রতিবেদক হিসাবে আপনি ভুলে যাবেন না পুরনো দিনের কথা। ভালো প্রশ্নের সব সময়েই মেলে ভালো উত্তর। পাশাপাশি মনেও আনবেন না সেই কথাটা—খোশ খবরের ঝুটাও ভালো।

একথা ঠিক প্রতিবেদন হল সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটু সহজ সর্ববোধগম্য সংরূপ, যদিও এটারই চাহিদা সবচেয়ে বেশি পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে। তবে সব প্রতিবেদনই আবার লেখা সহজ নয়। অর্ন্তুতদন্তমূলক প্রতিবেদন রচনা তো খুবই জটিল। সেখানে বিচক্ষণতার সঙ্গে আইনি অভিজ্ঞতা থেকে নানা বিষয়ে অধীত বিদ্যার ছাপ রাখতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশাদার গোয়েন্দাও হার মেনে যেতে পারেন প্রতিবেদকের রিপোর্টের কুশলতার কাছে।

প্রসঙ্গত, কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন ভালো প্রতিবেদন বলতে আমরা সচরাচর কী বুঝি। সর্বজনবোধ্য ভাষায়, সরস লিখন শৈলীতে কোনো জটিল বিষয়কে যখন তথ্যসমৃদ্ধ করে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠকের সামনে পরিবেশন করা হয় তাকে ভালো প্রতিবেদন বলা যেতে পারে। এখানে

মনে রাখবেন চমৎকার প্রতিবেদনের ভাষাও হবে ঝকঝকে, জনচিত্তজয়ী অথচ থাকবে তাতে মেধার দ্যুতি, মননের ছাপ। যুক্তির পরাম্পর্য রক্ষিত হবে প্রতিবেদনের মধ্যে, আবার তা পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতে কিংবা দেখতে দেখতে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মধ্যে জাগবে অপার কৌতূহল। প্রতিবেদক এমনভাবে প্রতিবেদন পরিবেশন করবেন যাতে গ্রাহক তাঁর রিপোর্টকে গিলে ফেলতে চাইবেন খুব তাড়াতাড়ি। এক কথায় প্রতিবেদন হবে সহজবোধ্য, নাতিদীর্ঘ কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ।

অনেক ভালো প্রতিবেদন প্রথম পুরুষে লেখা যেতে পারে। লেখাও হয়েছে। এই ধরনের প্রতিবেদনে প্রতিবেদক নিজের মতামত প্রকাশের সুবিধা নিতে পারেন, নিয়েও থাকেন অনেকে। তবে উত্তম পুরুষে রচিত প্রতিবেদনে একটা বিপদের সম্ভাবনাও নিহিত থাকে। কেউ কেউ প্রতিবেদনের শুরুতেই এমন বেমক্কা মন্তব্য করে বসেন যার ফলে প্রতিবেদনের গ্রাহক হারিয়ে ফেলেন যাবতীয় আগ্রহ। এতে প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যটাই মার খেয়ে যায়। কাজে কাজেই আপনি যদি প্রথম পুরুষে প্রতিবেদন তৈরি করবেন বলে মনে করেন, তাহলে গোড়াতে আপনার কোনো মন্তব্য চাপিয়ে দেবেন না। কোনো সিদ্ধান্তও জানাবেন না। এখানে প্রতিবেদককে হতে হবে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক।

প্রসঙ্গত আসে প্রতিবেদনের বিন্যাস নিয়ে দু-চার কথা। বলাই বাহুল্য, এই বিন্যাসের ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করে বর্ণিত বিষয়ের ওপর। আবার কখনো কখনো তা সাংবাদিকের বিশেষ ঝোঁকের ওপরও দাঁড়ায়। এমন কি, কোনো ব্যাপারে যদি সাংবাদিক বা প্রতিবেদক বিশেষত বা স্পেশালিস্ট হন তবে তাঁর সেই বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে প্রতিবেদনের বিন্যাস। এর ফলে লাভবান হন সকল পক্ষই। প্রথমত সাংবাদিকের ইচ্ছাপূরণ হল, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়, পাঠক-শ্রোতা-দর্শক অনেক অজানা তথ্যের হদিশ পান। তাই—

- প্রতিবেদক হিসাবে প্রথমেই আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে যে প্রতিবেদনটিতে আপনি কী বলতে বা জানতে বা শোনাতে চাইছেন।
- ঘটনাকে ঘিরে যেসব তথ্য আপনি যোগাড় করেছেন, একটা ধারণাও গড়ে নিয়েছেন মনে মনে, তার থেকে আপনাকে বেছে নিতে হবে কী কী আপনি ব্যবহার করবেন পাঠকের-শ্রোতার-দর্শকের কৌতূহল মেটাতে, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে এবং সমীহ আদায় করতে।
- প্রাপ্ত ও নির্বাচিত তথ্যগুলিকে কত সুন্দরভাবে, যুক্তিসহ নিপুণতার শব্দে পরিবেশন করতে পারেন সেটাই হবে মূল লক্ষ্য। এটা রপ্ত করা খুব সহজ নয়, বেশ অনুশীলন সাপেক্ষ।

উল্লিখিত বিভিন্ন ধাপকে সচেতনভাবে প্রতিবেদন তৈরির কাজে লাগিয়ে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সত্যিসত্যিই আপনি একজন ঝকমকে রিপোর্টার।

এবারে দেখা যাক প্রতিবেদন কীভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

- প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে বিষয়ে বা ঘটনাকে নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে তার উদ্দেশ্য কী। রিপোর্ট সব সময়েই তৈরি হয় সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনার ওপর বিস্তৃত সংবাদ নিয়ে। সেখানে ঘটনাটিকে বিশদভাবে প্রত্যক্ষ করানো, মূল্যায়ন ঘটানো ও সাধারণের জানার কৌতূহল মেটানো প্রধান কাজ। যে গণমাধ্যমে বেশি বেশি করে গ্রাহকের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা থাকে বা গ্রাহককে অধিক সংখ্যক সংবাদ সরবরাহ করে সেই গণমাধ্যমটি লাভ করে গ্রাহক-সমৃদ্ধি।

- দ্বিতীয় ধাপে পরীক্ষা ও শ্রেণিবিভাজন করে বুঝে নেবেন যে খবরগুলি, বা তথ্যসমূহ আপনি যোগাড় করেছেন তা প্রতিবেদনের জন্য নির্ধারিত বিষয়টির নিখুঁত ছবি তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট কি না। মনে রাখতে হবে, পাঠক-শ্রোতার কাছে রিপোর্ট এঁকে দেয় ঘটনার বিশদ জীবন্ত বর্ণনা।

- তৃতীয় পর্যায়ে দেখতে হবে আপনি যে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন সেজন্য সংবাদের তথ্য নির্বাচন নির্ভুল হয়েছে কিনা। আপনি রিপোর্ট করার জন্য যা যা খবর সংগ্রহ করবেন তার অনেক কিছুই একসময় আপনার মনে হবে অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে আপনি আপনার সংগৃহীত তথ্যগুলি ভালোভাবে ঝাড়াই-বাছাই করে নেবেন গ্রাহকের কৌতূহল মেটানো ও সন্ধিৎসা বাড়ানোর জন্য। এর পরেই প্রতিবেদন তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।

- সংগৃীহত ও নির্বাচিত তথ্যগুলিকে যুক্তি পরম্পরায় ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে পরপর সাজিয়ে ভাষার বুনুনিতে গেঁথে তুলবেন আপনার প্রতিবেদনটি। প্রত্যেক প্রতিবেদনের থাকে একটি ছোট্ট ভূমিকা যাকে বলা হয় Intro। তাকে অনুসরণ করে গড়ে উঠবে শরীর। সবশেষে উপসংহার। অবশ্য অবয়বকে আপনি পয়েন্ট অনুসারে কয়েকটি ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ভাগ করে সাজিয়ে নিতে পারেন।

- Intro বা ভূমিকাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে মোটেও কসুর করবেন না। বরং এখানেই উস্‌কে দেবেন পাঠকের আগ্রহ। যা বলবেন তা যেন সরাসরিই পাঠক-শ্রোতা-দর্শক বুঝতে পারেন, এটা খেয়াল রাখবেন। কোনরকম ভাষার মারপ্যাঁচ, অলংকারের ঝংকার বা বাগাড়ম্বর ভূমিকায় থাকবে না। এই লক্ষ্য পূরণ হতে পারে নানা পদ্ধতিতে।

১১৯.৪ সারাংশ

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা একটি আকর্ষণীয় বিষয়। বৃত্তি হিসাবে তা মর্যাদাপূর্ণ, চমকপ্রদ-ও। শিল্পব্যবসায়ে এর গুরুত্ব বর্ধমান। সাংবাদিকতায় একদিকে থাকে নিশ্চয়তা, পাশাপাশি নিহিত সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। সাংবাদিকতার মধ্যে থাকে জনগণকে শিক্ষিত, সংগঠিত, উদ্দীপিত করার শক্তি। তা নিছক যৌথ প্রচারক ও আন্দোলনকারী নয়, তা সম্মিলিত সংগঠকও। এ হেন সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটে লিখিত মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রে, নিউজ এজেন্সিতে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যম হিসাবে বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদিতে। আবার, সাংবাদিকতায় রয়েছে নানা ধরনের সংরূপ বা Genre। প্রতিবেদন হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংরূপ। এর প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদটিকে বলে 'লীড'। এই 'লীড' বা প্রথম অনুচ্ছেদ রচনার সময় 'ছয়-ক' মেনে চলতে হয়। যেগুলি হল—(১) কে? (২) কী? (৩) কখন? (৪) কোথায়? (৫) কেন? (৬) কেমন করে? বাস্তবিকই, প্রতিবেদনের 'লীড' বা ভূমিকা বা প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদটিকে যেমন করে তুলতে হয় আকর্ষণীয়, কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি উপসংহার হবে পুরোপুরি বাহুল্যবর্জিত, টানটান। তবে বিষয় ও রিপোর্টের আঙ্গিকটি যাতে গ্রাহকের অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে, সেটা খেয়াল রাখবেন।

রিপোর্টের অবয়বেই থাকবে বিশদ বিবরণ। সেখানেই ঘটবে তথ্যের সমাবেশ। তবে নীরস সংখ্যাতত্ত্বে ঠেসে দেবেন না আপনার যত্নে গড়ে তোলা প্রতিবেদনটিকে। এতে পাঠক বিভ্রান্ত হন। আর বিষয়ের গুরুত্ব, গ্রাহকদের মনস্তত্ত্ব বুঝে নিয়ে অবয়বটির বিস্তৃতি ঘটাবেন। কোথাও পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করবেন না।

উপসংহার হবে সবসময়েই ছোট্ট। এখানেই আপনি প্রতিবেদনটির নির্যাস পরিবেশন করতে পারেন। পরিস্থিতির মূল্যায়নও ঘটাতে পারেন এখানে।

১১৯.৫ অনুশীলনী

ক. ছোট প্রশ্ন

নিচে একটি ছোট প্রশ্ন আর তার উত্তরে নমুনা দেওয়া হল। লক্ষ্য করুন উত্তর একটি বাক্যে সম্পূর্ণ হচ্ছে। এর জন্য বরাদ্দ নম্বর ১।

প্রশ্ন ঃ 'সংরূপ' পরিভাষাটি কোন্ ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ?

নমুনা উত্তর ঃ 'সংরূপ' পরিভাষাটি ইংরেজি Genre শব্দের প্রতিশব্দ।

ছোট প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লিখতে হয় দেখলেন। এবার, একটি করে বাক্যে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

১। প্রতিবেদন শব্দটি কোন্ ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ?

২। গণমাধ্যমকে কি বিশ্বের বাতায়ন বলা যায়?

৩। জন্মসূত্রে কি কেউ সাংবাদিক হন?

৪। প্রুফ সংশোধক কি সাংবাদিক?

৫। প্রতিবেদনের গদ্য কীরকম হয়?

খ. মাঝারি প্রশ্ন

নিচে একটি প্রশ্ন, আর তার উত্তরের নমুনা দেওয়া হল। লক্ষ্য করুন উত্তরের দৈর্ঘ্য খুব বড়ো নয়। সাধারণত ৫/৬টি বাক্যে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এবং প্রশ্নের মান ৫। অর্থাৎ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরের জন্য নম্বর বরাদ্দ ৫।

প্রশ্ন ঃ পাঠ্যবিষয় হিসাবে সাংবাদিকতার বিশেষত্ব কোথায়? ৬/৭টি বাক্যে লিখুন।

নমুনা উত্তর ঃ পাঠ্যবিষয় হিসাবে সাংবাদিকতা বেশ আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর। সামাজিক মর্যাদায় ও স্বাতন্ত্র্যে তা উজ্জ্বল। ব্যবহারিক জীবনেও পেশা হিসাবে সাংবাদিকতার স্থান অনেক উচ্চে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে আদর্শগত সংগ্রামের শাণিত লেখনী-অস্ত্র হল সাংবাদিকতা। এই বিষয়টি কখনওই মুখস্থবিদ্যার প্রদর্শনী নয়। এ হল হাতে-কলমে দেখানোর বিষয়। এর প্রায়োগিক দিকটিই সবচেয়ে মূল্যবান।

এবার নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর পাঁচ-ছটি বাক্যে লিখুন।

গ. বড় প্রশ্ন

১। প্রতিবেদন কীভাবে বিন্যস্ত করা হয়, তা ১০টি বাক্যে লিখুন।

২। আমাদের জীবনে সংবাদের গুরুত্ব কোথায়, আলোচনা করুন।

৩। সাংবাদিক হতে গেলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, উল্লেখ করুন।

১১৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। এফ. ফ্রেজার বন্ড : *সাংবাদিকতার গোড়ার কথা।*

২। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : *সংবাদপত্রের রূপায়ণ।*

৩। H.W. Steed : *The Press.*

একক ১২০ ❑ সাংবাদিক সংরূপ ও প্রতিবেদনের শিরোনাম

গঠন

১২০.১ উদ্দেশ্য

১২০.২ প্রস্তাবনা

১২০.৩. মূলপাঠ

১২০.৩.১ সাংবাদিক সংরূপ

১২০.৩.২ হেডলাইন বা শিরোনাম

১২০.৪ সারাংশ

১২০.৫ অনুশীলনী

১২০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১২০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়ুন। তাহলেই আপনি মনে মনে গড়ে নিতে পারবেন,

- সাংবাদিকতা অর্থাৎ Journalism শব্দটি কীভাবে তৈরি হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি ধারণা।
- সাংবাদিকতা বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটাও আপনি জানতে পারবেন এই এককটি পাঠ করলে।
- সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রেসের স্বাধীনতার ব্যাপারটা কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, স্বাধীনতা বলতেই বা কী বোঝায় সেসব ব্যাপারে আপনি নিজের মতামত তৈরি করে নিতে পারবেন এই এককটির মধ্যস্থতায়।
- সাংবাদিকতার কাজে দায়িত্ব কতখানি সে সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা গড়ে উঠবে এখানে।
- সংরূপ বা Genre বলতে কী বোঝায়, সংরূপ বিচারের মান কী কী, তাদের পার্থক্য কোথায় এবং সাংবাদিক হিসাবে আপনি কখন কোন্ সংরূপটি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন এই এককটি কয়েকবার পাঠ করলে।

- সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌রের অবয়ব নিয়ে বিভিন্ন মতের সন্ধান পাবেন এখানে।
- বিভিন্ন সাংবাদিক-সংরূপের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করতে পারবেন এই এককটিতে। এর ফলে তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের ব্যাপারে আপনার মনে কোন সংশয় হয়তো দেখা দেবে না।
- হেডলাইন বা শিরোনামের গুরুত্ব কোথায়, এবং বিশেষ করে মুদ্রিত প্রতিবেদনে শিরোনাম দানের পদ্ধতি কী, সে বিষয়েও আপনি একটি ধারণা গড়ে নিতে পারবেন এই এককটির মধ্য দিয়ে।

১২০.২ প্রস্তাবনা

প্রেস বা সংবাদপত্রের জগতকে কেউ কেউ বহুমস্তকবিশিষ্ট দৈত্যের সঙ্গে তুলনা করতে ভালোবাসেন। আবার অনেকেই মনে করেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। তা যাঁরা যে চোখেই দেখুন না কেন সংবাদ হল জীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত। একে বলা যায় প্রাণরস বা প্রাণশক্তি। কেউ কেউ তাই বলেন, জনগণ যা চায়, তাদের তাই দেওয়া হল সাংবাদিকতার কাজ। উল্টোদিকে কেউ কেউ বলেন, যে সত্য জনগণের জানা বিশেষ দরকার, তাদের তা জানতে দাও। এই দুই মতবাদের মধ্যে যে সত্যটিকে কোনভাবেই আর ঢেকে রাখা যায় না তা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারটা। সব দেশেই সর্বকালেই এই ব্যাপারটা নিয়ে নানান মতের চাপান-উতোর আছে, ছিল, থাকবেও হয়তো। তবে একথা সত্য, আগেকার দিনে শাসক ও ধর্মযাজকেরা সেই সংবাদই প্রচার করতে দিতেন যা তাঁদের পক্ষে নিরাপদ। তাঁদের মতের বিরোধী সবরকম সংবাদই শাসক ও পুরোহিত-মোল্লা-যাজকেরা চেপে দিতেন। কারণ তাঁরা ভয় পেতেন বাইবেলের সেই অমোঘ বাক্যটি—'সত্যই তোমায় মুক্ত করবে'। একালের শাসকেরাও মেনে নিতে পারেন না রবীন্দ্রনাথের কথা—

মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

সাংবাদিকতা যে সামাজিকভাবেই অপরিসীম মূল্যবান, নির্ভীক চিত্তে উন্নতশির দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং উচ্চতর মর্যাদাপন্ন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান বিশ্বে যেদিন থেকে জীবনের সূচনা সেদিন থেকেই মানবসমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে সংবাদ। না, শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যতর প্রাণীজগতেও এর ভূমিকা ন্যূন নয়। কীটপতঙ্গ থেকে জীবজন্তুও বুঝতে পারে কীসে

তাদের বিপদ আসছে এবং তা মুহূর্তের মধ্যে তারা নিজেদের সমাজে এক-এক উপায়ে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। এই যে বিপদের সম্ভাবনা ছড়িয়ে দেয় সেটাই তো সংবাদ। সঠিক সময়ে সঠিক বার্তার বিকল্প আর কিছু কি হতে পারে? সংবাদের জন্যই তো ঘুরঘুর করেন গুপ্তচর, সোর্স পোষেন রাষ্ট্রদূত-প্রশাসন-সরকারি ও সরকারবিরোধী দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন। শোষণ-শাসন-ত্রাশন অক্ষুণ্ণ রাখতে, স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বা পাল্টে দিতে সকলেই চায় প্রচারযন্ত্রকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ যেদিক থেকেই বিচার করে দেখা যাক না কেন, প্রেস বা সংবাদপত্র-বেতার-দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যম হল সমাজসেবার সমাজশোষণের এক প্রধান হাতিয়ার। সাংবাদিকতা সে কারণেই এত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটে নানামুখী সাংবাদিক-সংরূপে। এর মধ্যে আবার প্রতিবেদনের স্থান খুবই উঁচুতে।

১২০.৩ মূলপাঠ

১২০.৩.১ সাংবাদিক সংরূপ

সাংবাদিকতা শব্দটি এসেছে সংবাদ + ইক + তা হয়ে। মানে হল সাংবাদিকের কাজ। বিশেষ্য। এটাও আপনি জানেন যে সংবাদ শব্দটির বুৎপত্তি হল সম্ + √বিদ্ (বলা) + অ। অর্থাৎ বিবরণ, বৃত্তান্ত। এই তাৎপর্যেই মনসামঙ্গলে পাবেন—

‘পদ্মার সংবাদ সব মৎস্যগণ জানে।’

আবার, সংবাদ বলতে বোঝায় বার্তা, খবর, সমাচার, সন্দেশবাক্য। কৃত্তিবাস তাই বলেন—

‘আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।’

কিংবা, সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।’

সাংবাদিকতাকে ইংরেজিতে বলে Journalism (জার্নালিজম্)। শব্দটি এসেছে লাতিন diurnalis থেকে diurnal হয়ে প্রাচীন ফরাসিতে Journal-এর ভিতর দিয়ে। মধ্যযুগীয় ইংরাজিতে তা Journal হল। এর সঙ্গে ist যুক্ত হয়ে যেমন জার্নালিস্ট বা সাংবাদিক হল, তেমনি ism যুক্ত হয়ে হল জার্নালিজম্ বা সাংবাদিকতা। অনেকে আবার জার্নালিজম্ শব্দটির শিকড় খুঁজে পান DIURNA-র মধ্যে। প্রাচীন রোমে যে প্রথাগত ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেনেটের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য খবরও জানিয়ে দেওয়া হত প্রকাশ্য জায়গায় একই নোটিশের একাধিক নকল ঝুলিয়ে বা সেঁটে দিয়ে তাকে বলা হত ACTA DIURNA এবং এর ভূমিকা রোমক সমাজে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা ভালো যে

Journalism শব্দটি আদিতে যে অর্থ বোঝাত এখন তা ছাপিয়ে গিয়েছে অনেকখানি, ঘটেছে অর্থের বিস্তার।

প্রশ্ন হল, সাংবাদিকতা বা জার্নালিজম বলতে কী বোঝায়? মুদ্রণ বা লিখন, চিত্রণ বা কথন, অথবা পারস্পরিক সংযোগে নানাধরনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা প্রবাহকে তুলে ধরে এবং জনগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে বিশেষ গুরুত্ব পায় এমনই একটি প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে এটি একটি শিক্ষার বিষয় বা জীবিকার উপায়। অন্যদিকে সাংবাদিকতা সমাজসেবার মাধ্যম বা অভিজাত ব্যবসা বা সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক বা আদর্শ বিস্তারের-সংগ্রামের-সংগঠকের কর্মধারা ও অনুষঙ্গ। বস্তুত, একালে সাংবাদিকতা বলতে বোঝায়, সংবাদ ও সংবাদভিত্তিক আলোচনা, মন্তব্য ইত্যাদি জনগণের কাছে কোন মাধ্যমের সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া। এই পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটায় যে উপকরণগুলো লাগে বা থাকে তাতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকেন যাঁরা তাঁরা হলেন সাংবাদিক। সত্য প্রকাশ ও পরিবেশনের তাগিদে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ (N = North, E = East, W = West, S = South > NEWS) অর্থাৎ এই পৃথিবীর চারদিক থেকে খবর জোগাড় করে এবং তার সত্যতা যাচাই করে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন ও প্রচার করে থাকেন সাংবাদিকেরাই। তাঁরাই সব কিছু জানান। জানার অধিকার সকলেরই জন্মগত অধিকার। ফলে, জনসাধারণের জানার অধিকার যেমন সাংবাদিকতায় স্বীকৃতি তেমনি তা মেনে নিয়ে জানানোর দায়িত্বও সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য। সত্য জানাটা সকলেরই বিশেষভাবে দরকার। তবে সত্যকে মেনে নিতে, জানান দিতে বেশিরভাগ সময়েই ভয় পান শাসকেরা। এই ভীতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেমন সত্য, তেমনি রূঢ় বাস্তব একনায়কতন্ত্রী, একদলীয় শাসনব্যবস্থায়। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, মিশ্র—সব আর্থ-সমাজব্যবস্থাতেই একথা পুরোপুরি খাটে। কখনো কখনো সত্য প্রকাশে বিচলিত হন প্রাপ্তির রাজনীতিতে বিশ্বাসী সরকার বিরোধীরাও। আর মৌলবাদীরা তো চেষ্টাই করেন সত্য-যুক্তি-বিজ্ঞান থেকে যতটা নিরাপদ দূরত্বে ঘেরাটোপের মধ্যে থাকা যায়। ফলে স্বাধীনতার জন্যই আসে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা। তবে সেই স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত থাকে দায়িত্বের ব্যাপারটা, কর্তব্যের বোঝা, এমনকি অঙ্গীকারের বোধ। আর সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টার ভিতরেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সত্যের জোর। পাশাপাশি সাংবাদিকতায় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হয় সেই স্বাধীনতা কাদের জন্য? এটা কি প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বাধীনতা, অথবা সংবাদকে বিকৃত, গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার স্বাধীনতা? অথবা, সাংবাদিকতায় অসুস্থতা আমদানির স্বাধীনতা? আসলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বরাবর ছিল, আছে, থাকবেও। লক্ষ্যণীয় যেটা, তা হচ্ছে, সেই স্বাধীনতা কার স্বার্থরক্ষক? মুষ্টিমেয়ের মুনাফা বৃদ্ধি, শোষণের উপায় বৃদ্ধি বা রাজনৈতিক সুবিধাভোগের স্বাধীনতার স্বার্থে বৃহত্তম জনগণের স্বাধীনতা বিসর্জন কখনোই সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বলে বিবেচিত হয় না, হতে পারে না।

হয়তো এ জন্যই অনেকে মনে করেন, একালের গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সমস্যা হল গণমাধ্যম ও তার স্বাধীনতা। সংবাদ হল সেই গণতন্ত্রের হৃদয়, জীবনশোণিত। পাশাপাশি এটাও ভুলে যাওয়া অসম্ভব যে গণমাধ্যমের বা প্রেসের ক্রিয়াকর্ম সামাজিকভাবেই খুব মূল্যবান, তা যথেষ্ট সম্মানজনক ও দায়িত্বপূর্ণ। জনস্বার্থে প্রেস যেমন সংবাদ দেয় তেমনি তার ভাষ্যও রচনা করে।

স্বাভাবিকভাবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সাংবাদিকতা কাজটি বেশ জটিল ও দুরূহ। নিজের ওপর পুরোপুরি আস্থা রেখে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে সৎ-নির্ভুল-দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও পরিশীলিতভাবে নিষ্পন্ন করতে হয় সাংবাদিকতার মতো কঠিন-দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবন্ধ থেকে সম্পন্ন করতে হয় এই ব্রত। সংবাদ জানানো, বোঝানো, ব্যাখ্যা করা, পরিচালনা ও আনন্দদানই শুধু নয়, পাঠক-শ্রোতা-দর্শক অর্থাৎ প্রেসের গ্রাহককে বিজ্ঞাপিত শিক্ষিত-সংগঠিত-উদ্দীপিত করে তোলাই সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য। সামাজিকভাবে এই ক্রিয়াকর্মটি মোটেও হেলাফেলার নয়। বরং মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তা দায়িত্বের পরিচয় বহন করে, আবার যথেষ্ট মর্যাদাসূচকও। সমাজের ভালোমন্দের অনেক কিছুই যে সাংবাদিকতার ওপর নির্ভর করে তা এখন আর কেউ অস্বীকার করেন না। যেদিন থেকে এই গ্রহে জীবনের সূচনা এক হিসাবে সেই দিন থেকেই সংবাদ হয়ে ওঠে মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এমনকি পশুজগতেও এর ভূমিকা ন্যূন নয়। বিশেষ করে যখন জীবজন্তুর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন তা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ে মানব জাতিরই স্বার্থে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীবজগতের অবদান কম নয়। তাই সকলেই সঠিক সময়েই চান সঠিক সংবাদ।

কেবল ব্যক্তিজীবনেই নয়, সমাজজীবনের পক্ষেও সংবাদ কল্যাণপ্রদ। রাষ্ট্রদূত ও রাণার, গুপ্তচর ও গণৎকার, নবজাতক ও মৃতদেহ, যুদ্ধবিমান ও ঠেলাগাড়ি থেকে কোন কিছুই বাদ যায় না সাংবাদিকতার আওতা থেকে। উপরন্তু এর বিশ্বাসযোগ্যতা হওয়া দরকার সবরকম সন্দেহের ঊর্ধ্বে। বাস্তবিকই জনসাধারণের বেসরকারি পরিষেবাদান হল সাংবাদিকতার লক্ষ্য। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনই কখনো শেষ কথা হতে পারে না একজন সাংবাদিকের কাছে। তাঁকে মনে রাখতে হয় সমাজের অগ্রগতি সাধনে তাঁর ভূমিকা কাঠবেড়ালির চেয়ে অন্ততঃ কম নয়। সাংবাদিক যে-খবর, যে-দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করেন তাতে তাঁকে অবশ্যই জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়। অর্থাৎ পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত থাকা সাংবাদিকের প্রাথমিক কর্তব্য। একজন চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর রোগীর যে সম্পর্ক অনেকটা সেরকম আস্থাই অর্জন করতে হয় সাংবাদিককে, প্রেসকে তাঁর গ্রাহকদের কাছে। তবে চিকিৎসককে যেখানে মেডিক্যাল ডিগ্রি লাভ করে ও তাঁর পেশাগত সংহিতা মান্য করে কাজ করতে হয়, সেখানে সাংবাদিকতা অনেকটা 'স্বাধীন' বৃত্তি। অবশ্য সাংবাদিককেও মেনে চলতে হয় কিছু বাইরের বিধি-নিষেধ, দেশের আইনকানুন, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি। কিন্তু একজন অসাধু চিকিৎসক খুব জোর যেখানে কয়েকজন

রোগীর ক্ষতি করতে পারেন সেখানে একজন অসৎ সাংবাদিক তার লক্ষ লক্ষ পাঠক-দর্শক-শ্রোতার মনে বিষ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। একজন ব্যবসায়ী তাঁর খদ্দেরদের দামে ঠকাতে পারেন, এমনকি বাজে মালও গছিয়ে দিতে পারেন, তাতে ক্ষতি হবে কিছু সংখ্যক মানুষের মাত্র, কিন্তু সাংবাদিক জেনে-শুনেও যদি মিথ্যা বিবৃতি, বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করেন তাতে হাজার হাজার মানুষ বিপথে চালিত হয়ে জাতিদাঙ্গা ঘটিয়ে দিতে পারেন, দেশকে ঠেলে দিতে পারেন সর্বনাশের দিকে। তাই যে-সাংবাদিক তাঁর গ্রাহকদের প্রতারণা করেন তিনি অসাধু ব্যবসায়ীর চেয়ে একজন মারাত্মক মানুষ বলে গণ্য হন। একজন অসৎ শিক্ষক তাঁর ক্লাশরুমের কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ভুল শিখিয়ে বিপথে চালিত করতে পারেন, একজন রাজনীতিবিদ খুব জোর কয়েক হাজার শ্রোতাকে ভ্রান্ত দিক্ নির্দেশ করে উত্তেজিত করে ভাঙচুর ঘটাতে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকতার সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততাকে পদদলিত করে একজন সাংবাদিক গোটা দেশ-জাতি-সমাজের সর্বনাশ সাধন করতে পারেন। কাজে কাজেই সাংবাদিকতার কাজ আকর্ষণীয়, সম্মানীয় হলেও তার দায়িত্ব অপরিসীম।

এই যে সাংবাদিকতা, তার প্রকাশমাধ্যম আবার সরলরৈখিক নয়। বরং বলা যেতে পারে এর প্রকাশমাধ্যম যেমন বিভিন্ন তেমনি তার প্রকাশভঙ্গিও বিচিত্রতর। অর্থাৎ সাংবাদিকতায় আমরা নানাবিধ সংরূপ বা জেন্‌রের দেখা পাই।

সংরূপ হল একটি বহুল ব্যবহৃত, ব্যাপক তাৎপর্যমণ্ডিত পরিভাষা। সম্ + রূপ = সংরূপ। অর্থাৎ কোনো রচনার বিশেষ ধরনটিই সম্যক রূপ বা মূর্তি বা আকৃতি এবং এটাই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র বা জ্যঁর। Genre শব্দটির শেকড় রয়েছে লাতিন Genus-এ। তার থেকে Generis, বহুবচনে Genera অর্থাৎ ধরন, রকম, হওয়া বা সত্তা। ফরাসি ভাষার মধ্য দিয়ে এই পরিভাষাটি গৃহীত হয়েছে জার্মান ভাষায় ও ইংরেজিতে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক-একরকম তাৎপর্যে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। শিল্পকলার ইতিহাসে যখন আমরা জেন্‌র-পেন্টিং কথাটি ব্যবহার করি তখন তার মানে গিয়ে দাঁড়ায়, দৈনন্দিন জীবনের চিত্রশোভিত অবিকল প্রতিলিপি। সংগীতের ক্ষেত্রে পরিভাষাটিকে ব্যবহার করি সিম্ফনি, অপেরা, সঙ্‌গ্ ইত্যাদি নানারকম কম্‌প্যাজিশনের শ্রেণিভেদ হিসাবে। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, উপন্যাস ছোটগল্প, পত্রসাহিত্য প্রভৃতি ছোট ছোট নানা ভাগ মেনে নিয়েও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থকর্তাগণ প্রধানত মহাকাব্য, নাটক, গীতিকবিতা—মূলতঃ এই তিনটি পরিচয় দিতে Genre-কে ব্যবহার করেন। সাংবাদিকতায় এর প্রয়োগ অনেকটা সাহিত্যের মতো। বস্তুত সাংবাদিকতা এক হিসাবে সাহিত্যেরই নিকটতম প্রতিবেশী। এমন কি, কেউ কেউ সাংবাদিকতাকে মনে করে সাহিত্যের অন্যতম আদল। বাঙালি কবি বিষ্ণু দে তো তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামই দেন ‘সংবাদ মূলত কাব্য’। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ইত্যাদি দু-চারটি

সাংবাদিক-সংরূপকে বাদ দিলে অধিকাংশ সংরূপেরই অস্তিত্ব মানেন না অনেকেই। আসলে একালে কোন সংরূপই নিজের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে আর বেঁধে রাখে না, অর্থাৎ সৃজনব্রতী সাংবাদিকেরা সংরূপের ধ্রুপদী ধারণাকে ভেঙে তছ্নছ্ করে দিয়েছেন, একের মধ্যে অপরের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে অনেক সময় বুঝে ওঠা দুরূহ হয়ে পড়ে কোন্টা সংবাদপ্রসঙ্গ বা নিউজ আইটেম আর কোন্টা প্রতিবেদন বা রিপোর্ট।

সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্রের বিচারের মান তিনটি—

- সংরূপের বিষয়,
- সংরূপের কার্যাবলি,
- সংরূপের পদ্ধতি।

আবার সাংবাদিক-সংরূপের পার্থক্যটি বোঝা যায়—

- বস্তুর চরিত্রে,
- বাস্তব লক্ষ্যে,
- সিদ্ধান্ত বা উপসংহার এবং সাধারণীকরণের নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে,
- ব্যবহৃত সাহিত্যিক-রীতিটির বৈশিষ্ট্যে,
- বাস্তব প্রতিফলনের পদ্ধতিতে।

সাংবাদিক হিসাবে আপনি যখন নির্দিষ্ট সংরূপটি ব্যবহার করবেন তখন মনে মনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবেন, এই ভেবে—

- যা বলতে চান তার মূল্যায়ন করে নেবেন হাতের নাগালে পাওয়া জ্ঞান ও তথ্যের সাহায্যে। বুঝে নেবেন কোন্ সংরূপটি আপনার বক্তব্য প্রকাশের সবচেয়ে জোরালো উপযোগী।
- যে সংরূপটি ব্যবহার করবেন তার জন্য সবরকম সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।
- যে-সংরূপই আপনি ব্যবহার করুন না কেন প্রয়োজনে তার চৌহদ্দি পেরোবেন গ্রাহকদের চিত্তরঞ্জনের স্বার্থে। এক্ষেত্রে মিত্র সংরূপ বা নতুন কোন স্টাইল আমদানি করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি জরুরি কথা হল, কোন্ কোন্ উপাদানের সমন্বয়ে সংরূপ নিজ নিজ কাজ করে যায়, তা সতত মনে রাখবেন। সেগুলি হল—

● বিষয়বস্তু।

কোন্ ঘটনার কোন্ দিকটা পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে জানাতেই হবে সেটা নির্ধারণ করে নেবেন প্রথম থেকেই। মনে রাখবেন, প্রতিটি সংরূপই কিছু-না-কিছু তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

● অভিপ্রায়।

কী কারণে গ্রাহকদের তথ্য সরবরাহ করছেন সেটা পরিষ্কার বুঝে নেবেন। প্রতিটি সংরূপই কোন-না-কোনভাবে নিজস্ব লক্ষ্য পূরণ করে।

● পদ্ধতি।

কোন্ পদ্ধতি বা উপায়ে আপনি আপনার গ্রাহকদের মধ্যে বিতর্ক উস্‌কে দেবেন, তথ্য জানিয়ে দেবেন, সৌন্দর্যবোধ চারিয়ে দেবেন, শিক্ষার বিস্তার ঘটাবেন ও মনোরঞ্জন করবেন সেটা মুহূর্তের মধ্যেই স্থির করে ফেলবেন। খেয়াল রাখবেন, প্রতিটি সংরূপের মধ্যেই কিছু-না-কিছু নান্দনিক ও মনোরম উপাদান অনিবার্যভাবেই নিহিত থাকে। মূলত সাংবাদিক রচনা দুটি মূল নীতির ওপর গ্রথিত হয়। একটি হল পর্ব আর একটি গঠন পদ্ধতি।

দ্বিতীয় মতটি হল—

সাংবাদিক-সংরূপের পর্বভাগ

আদি | মধ্য | অন্ত্য

দ্বিতীয় মতটি হল—

সাংবাদিক-সংরূপের গঠন পদ্ধতি

উন্মোচন বা প্রকট | সম্প্রসারণ বা বিশদ | উপসংহার বা সিদ্ধান্ত | চূড়ান্ত মন্তব্য বা অভিমত

অর্থাৎ,

● উন্মোচনে ঘটবে উদ্দীপিত ভূমিকা;

● সম্প্রসারণে থাকবে বিশদভাবে বিষয়বস্তু, পরিসংখ্যান বা তথ্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং ক্রিয়ার তীব্রতা;

● উপসংহারে থাকবে বিশ্বাসযোগ্য সমাধান;

● চূড়ান্ত মন্তব্য তা অভিমতে বাঞ্ছিত পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের নির্ভুল মুক্তি।

এছাড়াও, প্রতিটি সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেনরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও বিচারের মানদণ্ডে যা যা পাওয়া যেতে পারে বা থাকলে ভালো হয় সেগুলি একে একে বলা যাক—

- সমকালীনতা বা টাটকা ঘটনা;
- কার্যকরিতা বা ফলপ্রসূতা;
- সর্বজনীনতা বা আন্তর্জাতিকতা;
- প্রচারধর্মিতা;
- ধারাবাহিকতা;
- গণমাধ্যমটির সক্রিয়তা
- সম্মিলিত সক্ষমতা।

এবারে আমরা কয়েকটি জনপ্রিয় সাংবাদিক-সংরূপের উল্লেখ করি। পাশাপাশি কয়েকটি সংরূপের দৃষ্টান্তও দিচ্ছি বাংলা পত্র-পত্রিকা থেকে।

❒ সংবাদ প্রসঙ্গ বা নিউজ-আইটেম

এই সংরূপটিরই ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সংবাদপত্রে, বেতারে, দূরদর্শনে। সাধারণভাবে কে বা কারা, কী, কখন, কোথায়, কেন, কীভাবে—এই ছ'টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই তৈরি হয় এক-একটি নিউজ-আইটেম। অবশ্যই এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে হেডলাইন বা শিরোনাম। উদাহরণ—

(ক) যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিলে উত্তাল গোটা আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৭ অক্টোবর—ইরাকে সম্ভাব্য হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে হাজার হাজার মানুষ গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হলেন রবিবার। ইরাকে হানাদারি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কতটা জরুরী এবং সাদ্দাম হুসেইন গোটা বিশ্বের নিরাপত্তার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক, সেসব গল্প শুনিয়ে দেশবাসীর সমর্থন আদায়ের জন্য সোমবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কথা রাষ্ট্রপতি বুশের। দেশবাসী যে বুশের এইসব যুক্তিকে আদৌ বিশ্বাস করছেন না, তা রাষ্ট্রপতি এবং প্রশাসনকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই তার ২৪ ঘন্টা আগে নিউয়র্ক, লস এঞ্জেলস, সানফান্সিসকো সিয়াটেল, শিকাগো, ওয়াশিংটন-সহ সমস্ত প্রধান প্রধান শহরে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল 'নট ইন আওয়ার নেম' নামে যুদ্ধ-বিরোধী সংগঠনগুলির একটি যৌথ মঞ্চ। এবং সর্বস্তরের মানুষ সে আন্দোলনে শামিল হয়ে পথে নেমে জানিয়ে দিলেন, এরপর বুশ ইরাকে হামলা চালালেও, মার্কিন জনগণের তাতে সায় থাকবে না। উল্লেখ্য, ইরাকে হানাদারির জন্য বুশ এই যুক্তিই দিচ্ছেন, নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য এ কাজ

প্রয়োজনীয়। শুক্রবারও এক অনুষ্ঠানে বুশ বলেছেন, একজন মার্কিন নাগরিকেরও ক্ষতি করার আগে শিক্ষা দিতে হবে ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেইনকে। মার্কিন নাগরিকরা তাই এই আওয়াজই তুলেছেন, ‘‘আমাদের নামে নয়।’’ গত কয়েকদিনই বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ তীব্র আকার নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াতে। ইতালিতে প্রায় ১০০ শহরে শনিবার অজস্র মিছিল-সমাবেশে অংশ নেন ১৫ লক্ষ (দেড় লক্ষ নয়)-এর বেশি মানুষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরেওও গত একমাস ধরে চলছিল বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা। গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্কের বৈঠককে ঘিরে বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন মাত্রা নিয়েছিল ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরোধী প্রতিবাদেও। শনিবারই পোর্টল্যান্ড ও অন্যান্য কিছু শহরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল সমাবেশ হয়েছে। কিন্তু, রবিবারের আন্দোলন ছিল আরও সার্বিক, আরও সংঘবদ্ধ। গোটা আমেরিকার সর্বত্র একই দিন পথে নেমে জনগণ জানিয়ে দিলেন, ইরাক বা সাদ্দাম হুসেইনকে নিকেশ করার কাজে বুশের পেছনে তাঁরা কেউ নেই।

এদিনের সবচেয়ে বড় সমাবেশটি হয় নিউ ইয়র্ক শহরের সেন্ট্রাল পার্কে। নানা বয়স, পেশা, জাতি, ধর্মের ২৫ হাজারের বেশি মানুষ অজস্র পোস্টার ও ফেস্টুন নিয়ে এই সমাবেশে শামিল হয়ে যুদ্ধ-বিরোধী স্লোগান দেন। ভিয়েতনাম ও আগের ইরাক যুদ্ধের প্রাক্তন সেনারাও এই সমাবেশে অংশ নেন। নজর কাড়ে একটি বিশাল ব্যানার, যাতে লেখা ‘‘আমাদের নামে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চালানো চলবে না, আমাদের নামে কোনও দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন চলবে না, চলবে না সাধারণ মানুষের ওপর বোমাবর্ষণ, অজস্র নারী-শিশুকে হত্যার অপকর্ম।’’ বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র তারকাও এই সমাবেশে সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন। অভিনেত্রী সুসান সারনভন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, ‘‘আমাদের জনগণ কী এই নব্য রোম সাম্রাজ্য মেনে নেবেন, তারা হত্যা ও যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বোঝে না? তাছাড়া অন্তহীন যুদ্ধ চালিয়ে কি নিজেদের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব?’’

একই ছবি সান ফ্রান্সিসকো শহরের ইউনিয়ন স্কোয়ারেও। বহু বিক্ষোভকারীকে দেখা যায় বড় বড় ড্রাম ও বিউগল বাজিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধী স্লোগান দিতে। রাষ্ট্রপতি বুশকে বিক্ষোভকারীরা বর্ণবাদী, হঠকারী ও হত্যাকারী বলে অভিহিত করেন। এক বিক্ষোভকারী বলেন, বধির প্রশাসনের কানে মানুষের দাবি পৌঁছে দেবার জন্যই তাঁরা ড্রাম ও বিউগলের সাহায্য নিয়েছেন। অর্থাৎ এতে যদি বুশ প্রশাসনের ঘুম ভাঙে। বহু ছাত্র-ছাত্রী সান ফ্রান্সিসকোর সমাবেশে হাজির ছিলেন। সমাবেশের বাইরেও বহু গাড়ির চালক হর্ন বাজিয়ে বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

লস এঞ্জেলসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অংশ নেন প্রায় দশ হাজার বিক্ষোভকারী। পুলিসের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন, শহরে এতবড় সমাবেশ তিনি আগে কখনও

দেখেননি। সমাবেশ আগাগোড়া ছিল শান্তিপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি বুশের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালাগালি ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া পুলিসের উদ্দেশে আর কিছু ছোঁড়েননি বিক্ষোভকারীরা। ঐ মুখপাত্র বলেন, একটা সময় তাঁরা ভেবেছিলেন, এতবড় সমাবেশ সহিংস হয়ে উঠলে তা সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠবে পুলিসের পক্ষে। কিন্তু, বিক্ষোভকারীদের ধন্যবাদ, কোনও গণ্ডগোল তৈরি তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা যে শান্তিই চান, নিজেদের আচরণেও বিক্ষোভকারীরা তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিকাগো, কলোরাডো, পোর্টল্যান্ড, ওরেগন ডেনভার ও আলাস্কা শহর থেকেও ব্যাপক যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভের খবর এসেছে। সর্বত্রই হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে স্লোগানে, ফেস্টুনে, ব্যানারে সোচ্চারে জানিয়ে দিয়েছেন, বুশের যুদ্ধে তাঁরা নেই।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

এরকম বড়ো নিউজ-আইটেমের পাশাপাশি ছোট ছোট নিউজ-আইটেম বা সংবাদ প্রসঙ্গও শোভা পায় সংবাদপত্রে। একে কোন কোন সংস্থা 'সংবাদচুম্বক' নামেও অভিহিত করেন। যেমন—

(খ) চিকিৎসকদের ক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি কলেজ থাকলেও স্নাতকোত্তর পড়াশোনা বা গবেষণার কোনও সুযোগ না থাকায় হোমিও চিকিৎসকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা হোমিওপ্যাথিতে ফার্মাসি কোর্স চালু করা এবং এই চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে রাজ্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দেরও দাবি জানিয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শ'তিনেক হোমিও চিকিৎসকের উপস্থিতিতে গত রবিবার কলকাতায় হোমিও মেডিক্যাল ক্লাব-এর ৪৭তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

❒ প্রবন্ধ বা আর্টিকল্

দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ বা আর্টিক্ল্ প্রকাশিত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-সংরূপ। এখানে যে সব সময় প্রতিষ্ঠানেরই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হবে তার কোনো মানে নেই। লেখকের স্বাধীনতা প্রায়শই রক্ষিত হয়, যদি না তা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ বলে বিবেচিত হয়।

❒ লীডার বা সম্পাদকীয়

চলতি সময়ের কোন একটি বিশেষ ঘটনা বা সমস্যা নিয়ে অন্তর্দৃষ্টি ফেলে সম্পাদকের কলামে এটি লেখা হয়। এই বক্তব্যকে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য হিসাবেই বিবেচনা হয়। যেমন—

(ক) কাবেরী বিতর্কে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ জরুরি

জলসম্পদের উপযুক্ত ও সুষম ব্যবহার ও বণ্টন যে-কোনো দেশের কাছেই জরুরি। বিশেষ করে জলের চাহিদা যখন দিনে দিনে বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে জল নিয়ে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে ঘোরতর কাজিয়া শুরু হয়ে গেছে। ফলে দু'রাজ্যেই বিপজ্জনক প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়েছে। বিষয়টি রীতিমতো উদ্বেগজনক। এবারে কাবেরী অববাহিকায় বৃষ্টি কম হওয়ায় জলের যোগান কমে গেছে। ফলে চাষবাসের জন্য জল এবং পানীয় জলের ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্কট তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় পরামর্শ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং কাবেরী রিভার অর্থরিটি (সি আর এ)। এদের সুপারিশের ভিত্তি হলো শুখা বছরে জলবণ্টনের নীতি। সুপ্রিম কোর্ট এবং সি আর এ তামিলনাড়ুর জন্য জল দেবার নির্দেশ দিয়েছে কর্ণাটক সরকারকে। কিন্তু কর্ণাটক সরকার ঐ রায় মানছে না। তাদের বক্তব্য হলো, এবারের জলের পরিমাণ খুব কম এবং জলের দাবিতে চাষীরা প্রথম আন্দোলনে নেমেছেন। ফলে কর্ণাটক সরকারের পক্ষে তামিলনাড়ুকে জল দেওয়া সম্ভব নয়। এই নিয়ে দু'দেশের মধ্যে প্রবল বিতর্ক চলছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আঞ্চলিক শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। তাই এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে যাতে অবাঞ্ছিত উত্তেজনা তৈরি না হয় সেদিকে দু'রাজ্যকে নজর রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে এগিয়ে আসা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বিদেশ যাত্রার আগে সোমবার সমস্ত দায় সুপ্রিম কোর্টের উপরে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু এই বাজপেয়ী সরকার ১৯৯৮ সালে ঘোষণা করেছিল যে, কাবেরী জল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, বাজপেয়ীর ঘোষণা ছিল শূন্যগর্ভ। বাজপেয়ীরা তখন সমস্যাটি ধামাচাপা দিয়ে গা বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বস্তি ক্ষণস্থায়ী।

দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নানারকম উত্তেজক মন্তব্য করে পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলছেন। যেমন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা দাবি জানিয়েছেন, জল না ছাড়লে কর্ণাটকের এস এম কৃষ্ণ সরকারকে অবিলম্বে খারিজ করতে হবে। তামিলনাড়ুতে কয়েকটি মহল দাবি তুলেছে, কর্ণাটকে বিদ্যুৎ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এইসব দাবির ভিত্তি হলো সঙ্কীর্ণ ও উগ্র প্রাদেশিকতা। এইসব দাবি যদি প্রবল হয়ে ওঠে তা হলে আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে বিপদ নেমে আসতে পারে। সামগ্রিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না চললে দু'রাজ্যের মধ্যেকার বিবাদের স্ফুলিঙ্গ অন্যান্য আরও নানা বকেয়া সমস্যার উপরে গিয়ে পড়তে পারে। ফলে বড় আকারের বিপদ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

একদিকে কর্ণাটক সরকার জল দেবার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট এবং কাবেরী নদী কর্তৃপক্ষের রায় বা সুপারিশ মানতে নারাজ। যার ফলে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপরে আঘাত নেমে আসতে পারে। অপরদিকে তামিলনাড়ু কাবেরী নদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে।

কর্ণাটক সরকারের উচিত তাদের অসুবিধার কথা কাবেরী নদী কর্তৃপক্ষকে (সি আর এ) জানানো। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এস এম কৃষ্ণ সরকারকে খারিজ করার দাবি জানিয়ে পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তুলছেন। জল নিয়ে এই কাজিয়ায় উন্নয়ন স্তব্ধ হবে।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা। কেন্দ্রের উচিত উত্তেজনা প্রশমিত করে পারস্পরিক সদ্ভাব ও আস্থার ভিত্তিতে এই সম্প্রচার সমাধান করা। কিন্তু বাজপেয়ী সরকার এখন নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসে আছে। তাদের উচিত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সমাধানের সূত্র খোঁজা। আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হলো কংগ্রেস এবং বি জে পি-র দুই রাজ্যের ইউনিটগুলি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় জড়িয়ে পড়েছে। এর পরিণতি বিপজ্জনক। কর্ণাটকের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ যে "পদযাত্রা"য় বেরিয়েছেন তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই পদযাত্রার ফলে কাবেরী বিতর্ক অহেতুক রাজনৈতিক রঙ পাচ্ছে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর উচিত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনে চলা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার উচিত সংঘর্ষে উসকানি না দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ তাই জরুরী।

● **গণশক্তি**

❐ কমেন্টরি বা মন্তব্য

বিতর্ক উস্‌কে দেবার ক্ষেত্রে কমেন্টরি বা মন্তব্য সংবাদপত্রের অন্যতম জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক-সংরূপ। দৈনন্দিন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যাপার নিয়ে টুকিটাকি মন্তব্য সরসভঙ্গিতেই সাধারণত এখানে উপস্থাপিত করা হয়। তবে কমেন্টরির মর্মমূলে থাকে যুক্তি। সত্যি কথা বলতে কি রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজারই প্রথম তাঁর ডায়েরিতে ব্যবহার ঘটান COMMENTARICI শব্দটি। এখান থেকেই কমেন্ট্রি শব্দটি এসেছে। বর্তমানে এর ঘটেছে অর্থব্যাপ্তি। যুক্তির সঙ্গে সরসতা মিশিয়ে তির্যকতা আনাই একালের কমেন্ট্রি বা মন্তব্যের মূলকথা। কখনো কখনো সপ্তাহের বিশেষ সমস্যা নিয়েও মন্তব্য করা হয় পত্র-পত্রিকায়। আবার কখনো কখনো সংবাদপত্র গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় রচনার প্রথাসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে সংক্ষিপ্তাকারে সম্পাদকীয়ের বদলে তির্যক পদ্ধতিতে মন্তব্য বা কমেন্ট্রি ছাপান। কেউ কেউ অবশ্য একে সম্পাদকীয়ই বলে চালাতে চান। সেখানে মন্তব্যের দায় বা দায়িত্ব সম্পাদকের ওপরেই বর্তায়। যেমন,

(ক) গড়াপেটা নয়?

দশ বছর আগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে কার্যত নেতৃত্ব দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের বুকে ছুরি বসিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মূর্তিমান অকল্যাণ। এবার গণহত্যার ছাই মাড়িয়ে অগৌরব যাত্রায় বেরিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তখন, সেই দশ বছর আগে, ধর্মীয়

গুণ্ডাদের শাবল-গাঁইতির আঘাতে বাবরি মসজিদ চুরচুর করে ভেঙে পড়ছে দেখে আনন্দে মুরলীমনোহর যোশিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন উমা ভারতী, সেই সংবাদচিত্র এখনও মাঝেমাঝে ছাপা হয়। তখন, সেই দশ বছর আগে, বি জে পি-র প্রধান দুই নেতা প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশ করেননি। অটলবিহারী বাজপেয়ী দুঃখে কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিনগুলোর মধ্যে একটি। রামরথারূঢ় হয়ে ভাঙার ও দাঙ্গার সলতে পাকিয়েছিলেন যিনি, সেই আদবানিও বাবরি মসজিদ ধ্বংসে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বলেছেন, লিখেওছেন, দুঃখে ও ক্ষোভে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন তিনি। সেই দুই দুঃখ-প্রকাশক এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী। বাজপেয়ী সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরেও বললেন, গুজরাটের সাম্প্রতিক ঘটনা ভারতবর্ষের লজ্জা। একাধিকবার তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মোদির কাজে তাঁর অনুমোদন নেই। গুজরাটের গান্ধীনগরের সাংসদ আদবানিও অতি সম্প্রতি মোদিকে সতর্ক থাকতে বলেছেন, প্ররোচনামূলক মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আদবানির সতর্কবার্তার পরদিনই মোদি আবার ওই 'হম পাঁচ হমারা পঁচিশ' বললেন, সঙ্গে 'ছশো পঁচিশ' জুড়ে দিলেন। মানে, মোদি দাঙ্গারথ চালিয়ে জিতুন গুজরাটে। এদিকে দুই প্রধান নেতা 'আহা উহু' করে নরম মুখ ধরে রাখবেন। গড়াপেটা নয়।

● আজকাল

কমেন্টরির পাশাপাশি বেতারে, দূরদর্শনে যে কমেন্টরির ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলে রানিং কমেন্টরি বা ধারাবিবরণী। সাধারণভাবে ঘটছে, চলছে এমন ঘটমান, চলমান ঘটনার বর্ণনা যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেই প্রাণবন্ত বিবরণ শোনানো, দেখানো হয় রেডিয়ও, টিভিতে তাকে বলা হয় রানিং কমেন্টরি বা ধারাভাষ্য। সংবাদপত্রে ধারাবিবরণী দেওয়ার সুযোগ নেই। খেলাধুলো, কোনো ঐতিহাসিক বা স্মরণীয় সমাবেশের বিবরণ শ্রোতা-দর্শকের কাছে তুলে ধরা জরুরি কর্তব্য বলে বিবেচিত তখনই রানিং কমেন্টরি বা ধারাবিবরণীর ব্যবস্থা করা হয়।

❒ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট

চল্‌তি ঘটনা বিষয়ে পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে জ্ঞাত করে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট। প্রত্যক্ষদ্রষ্টার লেখনীতে প্রতিবেদন তৈরি হয় বলে নিউজ-আইটেমের সঙ্গে প্রতিবেদনের আবেদনে তফাৎ ঘটে যায়। তাছাড়া প্রতিবেদনের ভাষা হয় অনেক প্রাঞ্জল। দৃষ্টান্ত—

(ক) রাতে ভয়াল আগুন ফিরপো মার্কেটে

স্টাফ রিপোর্টার : মঙ্গলবার রাতে ধর্মতলার ফিরপো মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লাগে। বাজারের সব ক'টি দোকানেই কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ওই বাজারে জামাকাপড় ও জুতোর বেশ

কয়েকটি দোকান আছে। দোকান বন্ধ করে দোকানিরা বাড়ি ফেরার পরেই বাজারের একটি ঘর থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি করে গোটা এলাকায়। আশপাশের বাড়ির মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। দমকলের ১৫টি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বেশিরভাগ দোকানেরই শার্টার ছিল বন্ধ। তাই আগুনের উৎসস্থলে এক ঘণ্টা পরেও পৌঁছতে পারেনি দমকল। দোকানগুলির শাটার কী ভাবে ভাঙা হবে, তা নিয়ে পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা দ্বিধায় ছিলেন। বাজারের মধ্যে কেউ কোনও ঘরে আটকে আছেন কি না, গভীর রাত পর্যন্ত দমকল তা জানতে পারেনি।

রাতে জওহরলাল নেহরু রোড বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দোকানিরা অনেকেই ছুটে আসেন। অনেককে মাথা চাপড়ে কাঁদতে দেখা যায়। হাজারখানেক লোক জমে যায় রাস্তার উপরে। কেন দমকল শাটার ভেঙে ঢুকতে পারছে না, তা নিয়ে উত্তেজিত দোকানদারদের সঙ্গে পুলিশ ও দমকল কর্মীদের রীতিমতো তর্ক বেধে যায়। পরিস্থিতির সামাল দিতে লালবাজার থেকে পাঠানো হয় র‍্যাফ। পাশেই মনোহর দাস তড়াগ থাকায় দমকলের জল পেতে সমস্যা হয়নি। ওই বাজারের পাশেই আছে একটি জামাকাপড়ের শো-রুম। ওই বাড়িতে যাতে আগুন না-ছড়ায়, দমকলকে তা দেখতে বলে পুলিশ। দমকল তাড়াতাড়ি চলে আসায় আগুন আর ছড়ায়নি। দমকল সূত্রে বলা হয়, দোকানগুলিতে জামাকাপড় ঠাসা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তা জতুগৃহ হয়ে ছিল। মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় রাতে বলেন, দোকানগুলি নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় দোকানদারেরা জানান, রাত ৯টার পরে একটি বন্ধ দোকানের তলা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। তখনও বোঝা যায়নি, ভিতরে ভিতরে দোকানগুলিতে আগুন কতটা ছড়িয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গোটা এলাকাকে গ্রাস করে। কাছেই দমকলের সদর দফতর থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়। দমকলমন্ত্রী প্রতিম চট্টোপাধ্যায়, মেয়র-পরিষদ মালা রায়কে দমকল ও পুলিশের সঙ্গে মিলে অগ্নি নির্বাপণের পরিকল্পনা তৈরি করতে দেখা যায়। পরে পৌঁছন মেয়রও। আগেকার ফিরপো হোটেল ভেঙেই পরবর্তী কালে গড়ে ওঠে ফিরপো মার্কেট। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সাহেব-মেম ও সম্পন্ন বাঙালিদের বৈকালিক মেলামেশার জায়গা ছিল ফিরপো হোটেলের বারান্দা।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

❒ শিল্পিত প্রতিবেদন বা রিপোর্টাজ

মূলত সংবাদপত্রের জন্য বিশেষ এক রীতিতে লেখা ঘটনার প্রতিবেদন হচ্ছে রিপোর্টাজ। একেবারে তরতাজা ঘটনা বা বিষয় বা অভিজ্ঞতার শৈল্পিক প্রকাশ এখানে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বিবৃত করা হয়।

এতে মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস টের পাওয়া যায়। ফুটে ওঠে বিবিধ দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। তথ্যের উপস্থাপনা সত্ত্বেও সাহিত্যের স্বাদ, নান্দনিক বোধ, অন্তর্জীবনের চিত্রায়ণ, কিংবা স্মৃতি-সত্তার অন্তঃসার রিপোর্টাজকে দেয় যেমন ডকুমেনটেশনের মূল্য তেমনি তা হয়ে ওঠে শৈল্পিক সুষমায় অনবদ্য। এক হিসাবে রিপোর্টাজ হল সংবাদ ও সাহিত্যের সম্মিলিত রসায়ন। দৃষ্টান্ত—

(ক) ফুঁসে ওঠে ইতিহাস

বরফ না পড়লেও বাইরে বেশ কনকনে শীত। চার থেকে পাঁচ-ছয় ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যেই ওঠানামা করছে পারদ। লেগেছে মাতন। দাপটের সবকিছুকেই উড়িয়ে নেবার নেশা বার্লিনের বাতাসে।

শুক্রবার। ৩১ মার্চ। ভোরবেলাতেই তৈরি হয়ে নিলাম। সারাদিনের জন্যেই বেরোচ্ছি একরকম। সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব আস্তানায়। বার্লিনের 'সুলে ডেয়ার সলিডারিটাট' অর্থাৎ সংহতি কলেজে।

চলেছি জাক্সেন হাউসে। ঐতিহাসিক কসাইখানায়। বুখেনভাল্ডেরই নাম শুনেছিলাম এর আগে। কিন্তু জাক্সেন হাউস? উঁহু, স্মরণে পড়ে না। আমি তো জানতাম বুখেনভাল্ডেরই জাল দিয়ে ছেঁকে তুলে জমা করেছিল দুনিয়ার কমিউনিস্ট আর প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে বেশি। ঐ বন্দীশালারই এক প্রান্তে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান থালমান নিহত হন। ছাপান্ন হাজার নানান দেশের মানুষ হলেন তাঁর অনুসারী। শহীদ হলেন পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি, ফিনল্যাণ্ডের মানুষগুলো। চোখে ছিল তাঁদের স্বপ্ন, মায়া, নতুন পৃথিবীর উজ্জ্বল আদল। কিন্তু জাক্সেন হাউস নয়। এই বন্দী শিবিরের নাম-ডাক শুনি নি তো।

এখন অবশ্য হুবহু সেই কসাইখানাটা নেই। ঘষে-মেজে সংস্কার করা হয়েছে। যে বিরাট এলাকা জুড়ে ছিল বন্দীশিবির, সেসব মডেলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন গাইড। অসংখ্য তথ্য আর ছবি, সময়-ক্রমিক অনুসারে সাজানো রয়েছে দেয়ালে দেয়ালে। মানচিত্রও। নাৎসী নায়কদের জীবনী। পাশাপাশি শহীদের কথা। জার্মান, রুশ, পোলিশ ফ্যাসিবাদ-বিরোধীদের ছবি।

এই তো ইতিহাসের অন্ধকার দিনগুলো। বাদুড়ের ডানায় ঢাকা দিনগুলি, রাতগুলি!

ঘুরে ঘুরে দেখছি সেই ঐতিহাসিক কসাইখানা। শ্বাপদের পদচিহ্ন।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ইতিহাসকে। বর্বরতার চলমান দিবস-রজনীর পদাবলী। তোলপাড় করছে শহীদবীরের আত্মদান। মানবসভ্যতার আকাশ-ফাটা চিৎকার।

ঝাড়ে-বংশে কমিউনিস্টদের কচুকাটা করার জন্যে কী কাণ্ডটাই না করল নাৎসীরা! যে-কোনো ছলছুতো করে পেটাও, পেটাও ঐ লাল জুজুর সাগরেদদের। আর এ-ব্যাপারে যেমন গুরু, তেমনি চেলাও

জুটেছিল সংখ্যাহীন। আশ্চর্য ব্যবস্থা। হিটলারের পয়লা নম্বর স্যাঙাৎ ছিলেন গ্যোরিং। গোয়েবলস নিলেন প্রচারের ছলাকলার ভার। চোখ ধাঁধানো সেসব আয়োজন। শোষণ আর নির্যাতনে পৃথিবী উঠল কেঁপে। বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ। চলল গণ-নিধন।

নাৎসী নায়কেরা বানালেন দিকে দিকে বন্দীশিবির, ফাঁসির মঞ্চ। কল্পনাতেই গা শিউরে ওঠে।

বছরটা ১৯৩৬। জাক্সেন হাউস সে-সময়ই তৈরি হল। ৩.৮৮বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই বন্দী শিবির। নির্মিত হল ৬৮টি কুঁড়ে। ৪৭টি দেশের বন্দীবীরের ভাগ্যস্থল। পশুরাও এর চেয়ে থাকত স্বর্গে। কয়েক বছরের মধ্যেই ফ্যাসিবাদের শিকার হলেন ২,০৪,৫৩৭ জন। তার মধ্যে এস-এস বাহিনী হত্যা করে ১,১৬,৮০১ জন। উপড়ে নেয় হৃদপিণ্ডের রক্তগোলাপ। গুড়ো-গাড়া থেকে শুরু করে বুড়োবুড়িও রেহাই পায়নি উলঙ্গ নেকড়ের রক্তমাখা থাবা থেকে। প্রত্যেক বছরের হিসেবেই ঠিক-ঠাক রাখা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কতজন বন্দী হয়েছিল, আর বেঁচেই বা ছিলেন কত লোক, তার হিসেব রাখা হয়েছে যেমন বছর ভিত্তিতে, তেমনি ১৯৪৫-এর জানুয়ারি থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত হিসবে রাখা হয়েছে মাসভিত্তিক।

সাজিয়ে রাখা হয়েছে একদিকে সেই সব হত্যাকারীর ছবি, যাঁরা ছিলেন হিটলারের বংশবদ, ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার নাটবল্টু।

পাশের ঘরে সংখ্যাহীন শহীদের মুখ। জাক্সেন হাউসের প্রতিরোধ সংগঠনের প্রাণবন্ত সেই সব নায়কের ছবি। বেশিরভাগই খুন হয়েছিলেন এই বন্দীশিবিরে, কেউ কেউ অবশ্য অন্যত্র। এই শিবিরের বেশিরভাগ শহীদই ছিলেন লেখক, সাংবাদিক, অধ্যাপক বা বুদ্ধিজীবী।

সাজানো রয়েছে নানান ধরনের চাবুক। সাপের জিভের মতো অন্ধকার দিনগুলোর স্বাক্ষরিত লক্‌লকে চাবুক সব। বন্দীদের পিঠে, বুকে সর্বত্র চলত এর অভিযান। ছোটবড় কতগুলো ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জও রয়েছে দেখলাম। ভেতরে থাকত বিষ। বন্দীদের শরীরে ফোঁড়া হত সূচ। রক্তের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যেত সর্বনেশে তরল পদার্থ। দেখতে দেখতে নীল অপরাজিতা ফুটে উঠত তাদের গায়ে। নেমে আসত নিবিড় নীলিমা। ঢলে পড়ত মৃত্যুর কোলে। একদিকে রয়েছে চুলের পাহাড়। ওরে বাপস্, এত চুল কিসের, কী হত এসব দিয়ে? এ-রকম প্রশ্ন একে একে ছুঁড়তে লাগলাম। বললেন গাইড : বন্দীদের মাথা কামিয়ে দেওয়া হত। আর ঐ যে দেখছেন চীনে মাটির বাসন, পাশে কাঁটা-চামচ-ছুরি, ওতে দেওয়া হত খাবার। মাথা পিছু বরাদ্দ ছিল রোজ ৩০০ গ্রাম শুকনো রুটি আর জল। তবে রুশ বন্দীদের জন্য ছিল মাত্র ১৫০ গ্রাম রুটিই শুধু।

১৯৪৫-এর ২১ এপ্রিল। শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর। হঠাৎ তোড়াজোড়, সাজো সাজো রব।

হুলুস্থুল কাণ্ড। সাড়া পড়ে যায় শিবিরে। বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হবে ট্রাকে করে। পর পর তোলা হবে জাহাজে। সেই শুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া হবে বাল্টিকের জলে। ছক মাফিক সব কাজ এগোতে লাগল। নাৎসীদের চোখেমুখে জ্বলছে কয়েক হাজার বাঘের ক্ষুধা। কালো ছায়ায় ঢাকা আকাশ। নেকড়েদের হম্বিতম্বি।

চারদিকেই যেন ভয়ঙ্করতা। এক হিংস্র ভয়ঙ্করতা ওৎ পেতে বসে। কী হবে, কী হবে ভাবনায় আচ্ছন্ন বাতাস। বারুদে ঠাসা বাতাস যেন।

সময় তখন স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে। প্রতি নিঃশ্বাসে বন্দীরা শুনতে পাচ্ছে পরস্পরের শ্বাস। ধ্বংসের মুখোমুখি কয়েক হাজার প্রাণ। না, আর হল না। এগিয়ে আসছে ঝড়ের বেগে সোভিয়েত বাহিনী, মৈত্রীবাহিনীর শরিক। গর্জে উঠলেন তাঁরা : খামোশ! দুশমন হুঁশিয়ার!

মিকলেনবুর্গের রাস্তায় বাধা পেল লাল ফৌজ। চলল লড়াই।

ক্ষতবিক্ষত রুশ বাহিনী শেষ পর্যন্ত ঘায়েল করল ফ্যাসিস্টদের। রক্ত আর ঘামের ভিতর দিয়ে ঝিলিক দিল জীবন। মিলিয়ে গেল বারুদের ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ নতুন আলোয়। ফুটে উঠল সূর্য। সোভিয়েত বাহিনী এগিয়ে এল জাক্সেন হাউসে। মুক্তি দিলেন বন্দীদের। নীলকণ্ঠ ইতিহাসে বহু দীর্ঘ চড়াই-উৎরাইয়ের হল এক সাফল্য অভিযান।

ঘুরে ঘুরে দেখার পালা শেষ।

বেরিয়ে এলোম ঘরগুলো থেকে। বন্দী শিবিরের খুপরি থেকেই যেন। আমাদের মাথার উপর এখন শান্ত আকাশ। সীমানাহীন নিবিড় নীলিমা।

বুকের ভিতর তোলপাড়। চোখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে আগুন। ফুঁসে ওঠে ইতিহাস!

❒ শোকসংবাদ বা অবিচুঅরি

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুতে তাঁর জীবনালেখ্য ফুটিয়ে তোলার মধ্যে নিবেদিত হয় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি তাকেই বলে শোকসংবাদ বা অবিচুআরি। যেমন—

(ক) শ্রীকৃষ্ণকান্ত (১৯২৭-২০০২)

তাঁর বাবা লালা অচিন্ত্য রাম ছিলেন লালা লাজপত রাইয়ের সহযোগী, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী জেলেও গিয়েছিলেন। সহ্য করেছিলেন ইংরেজ শাসকদের অনেক অকথ্য অত্যাচার। তাঁদের পুত্র কৃষ্ণকান্তেরও যে রাজনীতিতেই স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবে সেটা তাই মোটেই

আশ্চর্যের নয়। লাহোর থেকে বারানসী, সেখান থেকে দিল্লি এবং শেষ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত পথটা কিন্তু এই 'তরুণ তুর্কি'র মোটেই মসৃণ ছিল না। তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি হবেন এটাই ছিল একেবারে অভাবিত। যেমন অভাবিত ভাবেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন কাল পর্যন্ত পূর্ণ সুস্থ কৃষ্ণকান্ত। তাঁর মা সত্যবতী এখনও জীবিত, বয়স ৯৭।

অবিভক্ত ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কোট মহম্মদ খানে কৃষ্ণকান্তের জন্ম। ১৯২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। লাহোরে ছাত্রজীবনের গোড়ায় জড়িয়ে পড়েন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন মাত্র ১৫ বছর বয়সেই। সেই বয়সেই ভোগ করেন কারাদণ্ডও। পরে চলে আসেন বারানসীতে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এসসি ডিগ্রি পান। জীবন শুরুও হয় বিজ্ঞানী হিসাবেই। কিন্তু বেছে নিলেন রাজনীতিকের জীবন। যেগ দিলেন কংগ্রেসে।

ষাটের দশকের শেষ দিকে ইন্দিরা গান্ধী যখন সিন্ডিকেটের নেতাদের সঙ্গে লড়ছেন, কৃষ্ণকান্ত এবং আরও কয়েকজন নেতা দলের নীতি নির্ধারণে রীতিমতো প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের পরে ইন্দিরা গান্ধী বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে ক্ষমতায় আসার পরে তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণকান্তদের মতপার্থক্য বাড়তে থাকে। জরুরি অবস্থা জারি করার তীব্র বিরোধিতা করায় ১৯৭৫ সালের দল থেকে বহিষ্কৃতও হন চার 'তরুণ তুর্কি'—কৃষ্ণকান্ত, চন্দ্রশেখর, মোহন ধারিয়া এবং রামধন। চার জনেই জেলেও যান।

দুর্নিতিমুক্ত রাজনীতির আদর্শে অবিচল কৃষ্ণকান্তের রাজনৈতিক জীবনের আর একটি পর্যায় আরম্ভ হল জয়প্রকাশ নারায়ণের সংস্পর্শে এসে। ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ অ্যান্ড ডেমোক্রাটিক রাইটসের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। সভাপতি ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত সারভেন্টস অব পিপলস সোসাইটির সদস্য ও পরে তার সভাপতি কৃষ্ণকান্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত গান্ধীয়ান ইন্সটিটিউট অব স্টাজিজের সদস্যও ছিলেন আজীবন। ১৯৬৬ থেকে '৭৭ পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। পরে লোকসভার সদস্যও হয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ সরকার তাঁকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের দায়িত্ব দেয়। ১৯৯৭ সালে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল। প্রধানমন্ত্রী হলেন '৪২ সালে এক সঙ্গে কারাদণ্ড ভোগ করা ইন্দ্রকুমার গুজরাল। প্রধানত তাঁর আগ্রহেই সে বছর উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পেলেন কৃষ্ণকান্ত। তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার আর বাকি ছিল মাত্র ২৪ দিন।

এক দিকে তিনি যেমন বিজ্ঞানের ভক্ত। অন্য দিকে তেমনই সাহিত্যানুরাগী। ভারতের পরমাণু অস্ত্র

থাকা দরকার বলে মনে করতেন। ‘সায়েন্স ইন পার্লামেন্ট’ পত্রিকার সম্পাদকও হয়েছিলেন। নির্বাচনী সংস্কারের পাশাপাশি প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও সরব হয়েছেন বারবার। সেই সঙ্গেই ছিলেন উর্দু কবিতার অনুরাগী।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

❒ সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভ্যু

প্রশ্ন-উত্তরের ফ্রেমে সাংবাদিক যখন খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিত্বের রূপ ও স্বরূপ, কর্মজীবন, ধ্যানধারণা, কৃতিত্ব ও ব্যর্থতাকে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে উপস্থিত করেন, সেই সাংবাদিক-সংরূপটিই হল সাক্ষাৎকার। যেমন—

(ক) কে বলে জয়সূর্যরা এগিয়ে, প্রশ্ন সৌরভের

প্রশ্ন : শ্রীনাথকে উড়িয়ে এনে খেলানোটা মস্ত বড় ফাটকা হয়ে যাচ্ছে না? এত লম্বা জার্নি করে এসেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা লোক মাঠে নামবে কী করে?

সৌরভ : সে তো যে কোনও পছন্দসই বোলারকে সুযোগ দেওয়াটাই চান্সের মতো। এক্সপেরিমেন্টটা খাটতেও পারে, না-ও খাটতে পারে। তা ছাড়া করতে তো হবে কেবল দশ ওভার। তা-ও একসঙ্গে নয়। শ্রীনাথ ম্যাচ ফিটও রয়েছে। নিয়মিত খেলেছে ওখানে।

প্রশ্ন : এটা তো আগরকরের মতো যারা টিমে আছেন, তাঁদের প্রতি অনাস্থা।

সৌরভ : অনাস্থা কেন? আমরা তো আগরকরকে খেলাতেও পারি। এমন হতে পারে যে শ্রীনাথ, আগরকর আর জাহির তিনজনেই খেলে কুম্বলে বসল।

প্রশ্ন : মাঝখানে বেশ কয়েকটা ওয়ান ডে ফাইনাল আমরা হেরেছি। গত বারের মিনি বিশ্বকাপ যেমন। আবার যাতে একই জিনিস না ঘটে, সেটা বুখতে কীসের উপর লক্ষ্য রাখছেন।

সৌরভ : এ বছর সবক'টা ফাইনাল বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ম্যাচগুলোয় কিন্তু আমরা জিতেছি। যেন ন্যাটওয়েস্ট ফাইনাল, গুয়াহাটিতে জিম্বাবোয়ে সিরিজ বা ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে শেষ ওয়ান ডে-টা।

প্রশ্ন : টানা হার থেকে জয়—এই রূপান্তরটা কী ভাবে এল?

সৌরভ : ফিজিক্যাল ফিটনেস অনেক বেড়েছে ছেলেদের। তাছাড়া ফাইনালে ভাগ্যও একটা ব্যাপার। সেটা কাজ করেছে।

প্রশ্ন : আজ রাতে টিম মিটিংয়ে কী বলবেন ছেলেদের?

সৌরভ : বলব, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে। বেশি যেন ফাইনাল-ফাইনাল ভাবতে না যায়।

প্রশ্ন : শ্রীলঙ্কাকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে।

সৌরভ : দেখাক, কাদের আত্মবিশ্বাস বেশি, মাঠে দেখা যাবে।

প্রশ্ন : জয়সূর্যের দাবি, ব্যাটিংয়ে দু'টো টিম সমান-সমান। কিন্তু শ্রীলঙ্কা জিতবে, কারণ তারা বোলিংয়ে এগিয়ে।

সৌরভ : কীসের এগিয়ে? জাহির এখন যা বল করছে, এর চেয়ে কি চামিণ্ডা ব্যাস বড় বোলার? দিলহারা ফার্নান্ডো কি শ্রীনাথের চেয়ে এগিয়ে? ওদের লেগস্পিনারটা কি কুম্বলের থেকে ভয়ঙ্কর? একমাত্র বলতে পারেন, হরভজনের চেয়ে মুরলী এগিয়ে।

প্রশ্ন : সহবাগের সঙ্গে ব্যাট করার অভিজ্ঞতা কেমন?

সৌরভ : খুব ভাল। দারুণ ব্যাট করছে ও। ওকে ফাইনালেও বলা আছে শুরু থেকে শট খেলতে। আমি অন্য দিকটা ধরব। এই স্ট্র্যাটেজিটা শুরু থেকেই আমাদের আছে। ন্যাটওয়েস্ট ফাইনালের মতো বড় স্কোর ধাওয়া করতে হলে অবশ্য অন্য কথা। সেখানে উপায় ছিল না বলে শুরু থেকেই দু'জনকে চালাতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : টস জিতলে কী করবেন?

সৌরভ : অবশ্যই ব্যাটিং। ফাইনালে ওদের মাঠে রান তাড়া সহজ হবে না।

প্রশ্ন : সচিন তেন্ডুলকরের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে?

সৌরভ : কেন? চার।

প্রশ্ন : বিশেষজ্ঞেরা অনেকেই মনে করছেন, সচিনকে অন্তত তিন নম্বরে তুলে আনা উচিত। আপনাদের জুটির ভাল শুরুর ছন্দটা ওয়ান ডাউনে অন্য কেউ গেলে হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানে সচিন খুব কাজে দেবেন। তাছাড়া সচিন যথেষ্ট বলও পাচ্ছেন না।

সৌরভ : হুঁ। ঠিকই।

প্রশ্ন : তা হলে-সচিন কত নম্বরে খেলবেন? তিন না চারে?

সৌরভ : চার।

প্রশ্ন : ভারতীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে?

সৌরভ : আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব, এই ভরসাটা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন : শ্রীলঙ্কার সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে?

সৌরভ : ওরা তিনজন সিমার খেলাবে। ধর্মসেনাকে বাদ দেবে। আর চেষ্টা করবে আমাদের পেসারদের শুরু থেকে ঠ্যাঙাতে। তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন, গত সাত ম্যাচের রেকর্ডে কিন্তু আমরা এগিয়ে আছি ৫-২য়ে।

প্রশ্ন : সমালোচক হিসাবে লিখতে হলে কী লিখতেন? ফাইনালের আসল নির্ণয়াক কী হতে যাচ্ছে?

সৌরভ : আমরা কত ভাল ব্যাট করতে পারি।

প্রশ্ন : বলা হচ্ছে, গোটা দেশে মন্দির হামলার পর তৈরি হতাশার রেশ মানুষ কাটিয়ে উঠেছে শুধু আপনার টিমকে সফল হতে দেখে। আপনি কি সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল?

সৌরভ : হতেই পারে। এখানে বসে এতটা তো টের পাওয়া যায় না। তবে ভারতের জনজীবনে ক্রিকেটের অসম্ভব প্রভাব আছেই। ছুটকো-ছাটকা ওয়ান ডে ম্যাচ জিতলেই কী না কী হয়, আর এটা হল মিনি বিশ্বকাপ ফাইনাল।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

এছাড়াও আরও অনেক Genre বা সংরূপের অস্তিত্ব রয়েছে সংবাদিকের ঝুলিতে। নিত্য-নতুন সংরূপও তৈরি হচ্ছে চলমান জীবনের দাবিতে, অভিজ্ঞতার আলোকে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় আলেখ্য বা Portrait, আলোচনা or Discussion সমালোচনা বা Review, টিপ্পনী বা Gloss, পুচ্ছপট বা Tale-pice, স্তম্ভ বা Column, Propayanda-Case, Feuilleton ইত্যাদি সাংবাদিক-সংরূপ বা Journalistic-Genres.

১২০.৩.২ হেডলাইন বা শিরোনাম

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিটি প্রতিবেদনেরই অপরিহার্য অঙ্গ হল তার শিরোনাম বা হেডলাইন। তবে নিছক প্রতিবেদন বা রিপোর্টের ক্ষেত্রেই যে হেডলাইন দিতে হয় তা নয়, খবরের কাগজে ছাপা হয় যেসব রচনা, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, মন্তব্য, নিউজ আইটেম ইত্যাদি প্রত্যেকটির বেলাতেই আলাদা আলাদা শিরোনাম থাকা বাধ্যতামূলক।

রিপোর্টার বা প্রতিবেদক যখন প্রতিবেদন তৈরি করেন তখন তারই অবিভাজ্য অংশ হিসাবে একটি শিরোনামও ব্যবহার করেন। অনেক সময় আবার বার্তা-সম্পাদক নিজে, কিংবা হেডলাইন যথাযথ হয়েছে কিনা দেখার জন্য যিনি ভারপ্রাপ্ত থাকেন তিনি সেই হেডলাইন অদল-বদল করে দেন বা দিতে পারেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে একজন সহ-সম্পাদক থাকেন যিনি প্রতিবেদন, নিউজ আইটেম পড়ে নিয়ে যুতসই শিরোনাম জুড়ে দেন। শিরোনাম বা হেডলাইন যে এত গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ অবশ্য অনেক। বাস্তবে

দেখা যায়, ব্যস্ততা বা সময়ের অভাবের জন্য পাঠকদের একটা অংশ সংবাদের ভিতরে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার সময় পান না। আবার এমন পাঠকও বেশি পাওয়া যায় না যাঁরা সবরকম সংবাদ সম্পর্কে সমান আগ্রহী। এর মূলে রয়েছে রুচির ভিন্নতা, শিক্ষার হেরফের, দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য। ভালো লাগা-না-লাগার জেরেই অনেক পাঠক যেসব খবর এড়িয়ে যান, কোনরকম আগ্রহই বোধ করেন না, সেইসব সংবাদই আবার আরেক দল পাঠক গোগ্রাসে গেলেন, কিংবা তারিয়ে তারিয়ে পড়ে পান আনন্দ। সংবাদপত্রকে কিন্তু নানান রুচির, মতের পাঠকদের কথা মনে রেখেই, সমাজের সর্বস্তরের পাঠক-গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করেই সংবাদ পরিবেশনে বৈচিত্র্য আনতে হয়। আর এই বিচিত্রতার বিজ্ঞাপন পয়লা দফার ঝলমলে করে আকর্ষণীয় হেডলাইনের সহযোগিতায়। তাই খবরের কাগজে শিরোনাম বা হেডলাইন তৈরির ব্যাপারটা কিছুতেই হেলাফেলার নয়।

তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিরোনাম দেবার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যে শিরোনাম দানের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে বা থেকে যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিরোনাম দেবার পিছনে লেখকের মানসিক প্রবণতা বেশি কাজ করে। তাছাড়া নামকরণও হয় নানা ধরনের। কবি, কথাকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, এমন কি চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ তাঁদের নিজ নিজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নামকরণ করে থাকেন কখনো বিষয়টির প্রাধান্য মাথায় রেখে, আবার কখনো বাঁক-ঘটানো মুখ্য ঘটনাটির ওপর সন্ধানী আলো ফেলে। নায়ক-নায়িকার নামেও যেমন শিরোনাম দেওয়া হয়, তেমনি আঙ্গিক, সময়-নির্ভরও নামকরণ করা হয়। নানা রঙের দ্যুতি ঠিকরানো হিরের টুকরোর মতো ব্যঞ্জনাধর্মী বা সাংকেতিক নামও সাহিত্যে কম জায়গা জুড়ে নেই।

কিন্তু সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের ইচ্ছানুসারে সব সময় শিরোনাম দেওয়া যায় না, বা হয়ও না। সাহিত্যের জগতে শিরোনামের জায়গাটিতে যেমন বিরাট এলাকা জুড়ে থাকে ভাবগর্ভ নামকরণ, সংবাদপত্রের বেলায় তেমনটি সচরাচর হয় না। বরং বলা যায়, কখনো কখনো ব্যঞ্জনাগর্ভ হেডলাইন পাঠককে বিপথগামী করে, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পান না তাঁরা। একথা খেয়াল রাখবেন সংবাদপত্রের সাধারণ পাঠকের চেয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা কমই শুধু নয়, অনেক বেশি সংবেদনশীলও। চিত্রশিল্প, ভাস্কর্যের দর্শকও ঠিক সাধারণ স্তরের নয়। এঁদেরও রয়েছে একটা নিজস্ব জগত, যার সঙ্গে সাধারণের ধ্যানধারণা মেলে না। অন্যদিকে খবরের কাগজকে পৌঁছুতে হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে। দিনকে দিন গ্রাহকসংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে, প্রতিযোগিতার বাজারে নামতে হয় সংবাদপত্রকে। একালে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি। গ্রাহকদের মন জোগানো, প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়ানো, বিজ্ঞাপনের বাজার দখল করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। ফলে সংবাদপত্রের কৌটোয় পুরে দিতে হয় দুনিয়ার খবর। তাই সাহিত্যের শিরোনাম দানের সঙ্গে

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের হেডলাইনকে একাসনে বসানো ঠিক নয়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের হেডলাইন হয় মূলত বিষয়নিষ্ঠ। দূরদর্শন, বেতারের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি মেনে নিতে খানিকটা অসুবিধা হতে পারে। নামকরণের ব্যাপারে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নই। শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়া গেছেন—গোলাপকে যে-কোনো নাম দেওয়া যাক তাহার মাধুর্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়তো তাহা খাটিতেও পারে, কারণ গোলাপের মাধুর্য সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ। তাহা কেবল গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য এমন সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে।' আবার, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যখন বেরোচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি তখন তিনি নামান্তর নামে ছোট্ট একটি আলোচনা সেরে নেন। 'বিচিত্রা'র প্রথম দু-সংখ্যায় উপন্যাসটি 'তিন পুরুষ' নামে ছাপা হচ্ছিল। তৃতীয় সংখ্যা থেকে কবি এর নাম দেন 'যোগাযোগ'। এই নাম পরিবর্তনের বিষয়ে লেখক যে কৈফিয়ৎ দেন তাতে নামকরণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মত আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি জানাতে কসুর করেন নি যে 'ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্যে, বিষয়গত নাম স্বভাবনির্দেশের জন্যে।' রবীন্দ্রনাথ আরো জানান, 'রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এইজন্যে বিষয়টাকেই শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না।' তিনি উদাহরণ দিয়ে আরো বেশি খোলসা করেন নিজের অভিমত। জানান, 'জাপানে দেখেছি, তলোয়ারের ফলকটার উপরে কারিগর যখন তার কারুকলার আনন্দ ঢেলে দেয় খাপটাকে তখন নিতান্ত নিরলংকার করে রাখে। গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন, নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকিবগিরি করতে না পাঠায়।'

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিটি শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বিষয়েরই দাদাগিরি। বৈষয়িকতাই এখানে বড়ো জায়গা জুড়ে। তাই প্রতিবেদনের হেডলাইনে বিষয়বুদ্ধি-প্রধান বিজ্ঞানের জয়জয়কার। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে হেডলাইন খবর নয়, সংবাদের চূড়ামাত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা নিজেই নিজের পরিচয় দেয়, হয়ে ওঠে মুদ্রিত সংবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুত, খবরের ভিতরে ঢুকবার ছাড়পত্র হল হেডলাইন, তা প্রথম দরজা। সংবাদের বিস্তৃত বিবরণটি পড়ে নেবার আগেই পাঠকের চোখ আটকে যায় হেডলাইনে বা শীর্ষনামে।

এই হেডলাইনকে হতে হয় খুবই আকর্ষণীয়। তা সংক্ষিপ্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। নেহাতই দু-চারটে শব্দ খরচ করে প্রতিবেদনের শিরোনামটি তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় সংবাদপত্রের লে-আউট

বা অঙ্গসজ্জা আড়াল থেকে নিতে পারে খানিকটা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা। হেডলাইনের ব্যাপারে তখন আর প্রতিবেদকের কোন ভূমিকা থাকে না। লে-আউট ডিজাইনার, প্রতিষ্ঠানের গ্রাফিকশিল্পীর দৃষ্টিতে যদি কোন হেডলাইন অঙ্গসজ্জার পক্ষে দৃষ্টিনন্দন না হয় তাহলে শিল্পীর কথামতো সেই শীর্ষনামকে বদলে দিতে পারেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। কেউ কেউ আবার হেডলাইনে চমক দিতে গিয়ে বিষয়সম্পর্ক-শূন্য এমন শিরোনাম ব্যবহার করেন যা সুস্থ সাংবাদিকতার পরিপন্থী। এতে বেশ কিছু পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। শস্তা জনপ্রিয়তা লাভের আশায় এমন হেডলাইন দেওয়া উচিত নয় যাতে পাঠক বেমক্কা হোঁচট খান, কিংবা বিষয়ের সঙ্গে হেডলাইনের মানে মেরুসমান ফারাক হয়। অনেকসময় এই ধরনের হেডলাইন ব্যবহার করা হয় ট্যাবলয়েডে, যার গোড়ায় থাকে হলুদ সাংবাদিকতার প্রেরণা। অবশ্য কোন কোন হেডলাইন বিষয়কে ছাপিয়ে বা বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েই হতে পারে কবিত্বঘেঁষা। সেখানে ছড়িয়ে পড়ে শিল্পের সুষমা। ইতিহাসের দরবারে জায়গা করে নেয় এরকমই শিল্পের রেণুমাখানো হেডলাইন।

সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র-এর ওপর নির্ভর করে তার হেডলাইন বা শীর্ষনামটি কেমন হবে। অর্থাৎ রিপোর্ট, রিপোর্টাজ, নিউজ আইটেম ইত্যাদি প্রত্যেকটি জেন্‌রের চরিত্র যেমন আলাদা তেমনি তাদের হেডলাইনের ধরনটিও হবে আলাদা আলাদা। ইদানিং অবশ্য অনেকে এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বিরুদ্ধে। হেডলাইনে তাই মুড়ি-মিছরি একাকার হয়ে যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই কবিতার পঙ্‌ক্তিঘেঁষা শিরোনাম দিতে সাংবাদিকেরা তৎপর হচ্ছেন।

এই ব্যাপারটা অনেকের চোখে ভালো ঠেকছে না। সে যাই হোক, ভালো-মন্দ বিচারের ভার গ্রাহক-পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। শেষ কথা বলার অধিকার কারো নেই। কোনো কোনো হেডলাইন হয় ইনফরমেটিভ। এখানে এক লহমায় পাঠকের কাছে সংবাদের সার জ্ঞাপন করাই হয়ে ওঠে হেডলাইনের কাজ। যেমন,

‘প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি’
‘মুখ্যমন্ত্রীর ফোন দিল্লিকে, রেল নিয়ে বসবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা’
‘মন্দির মুক্ত, গুজরাটে সেনা, সতর্ক দেশ’
‘গুজরাটের মন্দিরে জঙ্গী হামলা, মৃত ৩০’
‘মহামিছিল জানালো রেল ভাগ মানবো না’
‘শ্রম আইন বদলের বিরুদ্ধে এককাট্টা শ্রমিক সংগঠনগুলি’
‘বাগডোগরাকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার দাবি’।

কোন কোন হেডলাইনে সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি, মন্তব্য স্পষ্টতা পায়। যেমন—

'জল, বাতাসহীন ছোট লক-আপ যেন বন্ধ কূপ'

'শিশু হাসপাতাল ফিরেছে পুরনো চেহারায়'

'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তাস খেলছে সব দলই'

'আজ দুর্বল বাংলাদেশকে পাচ্ছে ভারত'।

কোন কোন হেডলাইনে রহস্যের হাতছানি, পাঠকের কৌতূহল জাগানোর প্রয়াস। যেমন—

'হীরক-রাজ্যে হঠাৎ সাবা'

'স্থাপত্যের অসামান্য প্রাঙ্গণ ছিলো নিরাপত্তাহীন'

'দীর্ঘ ৩১ বছর পর'।

'পকেট বাঁচাতে বাজারে গোয়েন্দা'।

হেডলাইনের মধ্যেই পাঠক বেশির ভাগ সময় পেতে চান প্রতিবেদনের ভিতরে কী আছে। রিপোর্তাজে কিংবা পোট্রেটে সেটা আশা করা সবসময় ঠিক নয়। এই ধরনের সাংবাদিক-সংরূপে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি-দৃষ্টিভঙ্গির মিশেল ঘটে। এক্ষেত্রে তথ্য অনেকসময় গৌণ হয়ে পড়ে। ভাষা ছুঁয়ে যায় সাহিত্যের সীমানা। শব্দের হৃদয় খুঁড়ে ব্যাঞ্জনার দ্যুতি পড়ে ঠিকরে। তাই রিপোর্তাজের হেডলাইন কবিতার পঙ্ক্তির মতো ভাবগর্ভ হতে পারে, হয়েও থাকে। যেমন—

'লালকমলের দেশে ওড়ে, মুক্তির পারাবত'

'ভূস্বর্গে মৃত্যুর মহড়া'

'শহিদ মিনারের মুখোমুখি'

'আচমকা মনে ভাসে পিকাসো'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে হেডলাইন বা শিরোনাম পাঠককে—

- বিষয় সম্পর্কে আগাম আভাস দেয় বা গাইড করে;
- খবর চালান দেয়, অর্থাৎ বিষয়টিকে ঘিরে তথ্য সরবরাহ করে;
- বর্ণিত ঘটনা বা সমস্যার মূল্যায়ন করে, অর্থাৎ বিষয়টির বিশেষত্ব কী সেটা মূল্যায়ন করার সুযোগ এনে দেয়;
- দৃষ্টিনন্দন সংবাদপত্র উপহার দেয়, অর্থাৎ হেডলাইন বা শিরোনামের থাকে গ্রাফিক ফাংশন।

এতেই শেষ হয়ে যায় না হেডলাইনের ভূমিকা। বরং হেডলাইন—

- পাঠকের কাছে কিছু কিছু নির্দেশ পৌঁছে দেয়;
- পাঠককে সংবাদ দেয়;
- বর্ণিত ঘটনার বা সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে;
- কৌতূহল জাগিয়ে তোলে;
- ঘটনার ভিতরকার ঘটনার সুলুকসন্ধান দেয়;
- পাঠকের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে;
- গভীরভাবে চিন্তা করতে পাঠককে সাহায্য করে;
- সর্বোপরি পাঠককে করে উদ্দীপিত ও সুশিক্ষিত।

সংবাদপত্রে হেডলাইন দেবার দায়িত্ব প্রতিবেদকের ওপর বর্তায় না। সেটি সহ-সম্পাদক বা সাব-এডিটরদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই হেডলাইনের জন্য হরফের পয়েন্ট নির্বাচন করতে হয় কলমের মাপ অনুসারে, অর্থাৎ হেডলাইনটি কত কলমের হবে। তদনুযায়ী কত পয়েন্টের শব্দ বসালে তা ওই বরাদ্দ কলমের মধ্যে ধরবে।

এছাড়া প্রতিবেদনের উপযুক্ত হেডলাইন রচনার সময়ে কয়েকটি জিনিস ভেবে দেখতে হয়। তা হল, প্রতিবেদনের শিরোনামে সাধারণভাবে—

- অতিশয়োক্তি বা উচ্ছাসপূর্ণ ভাষা ব্যবহার বর্জনীয়;
- অলংকারের আধিক্য অনভিপ্রেত;
- ভবিষ্যদ্বাণী পরিত্যাজ্য;
- অঘটিত ঘটনার আভাস পরিহারযোগ্য;
- বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হেডলাইন বিভ্রান্তি ছড়ায়, তাই তা বাদ দেবেন;
- ঘটনার ইঙ্গিত থাকবে, কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা না থাকলে ভালো;
- যেন কৌতূহল জাগিয়ে তোলে,
- বর্তমান কালের ব্যবহারই কাম্য;
- অনুজ্ঞাবাচক, আদেশধর্মী শব্দ বর্জনীয়;
- যথাসম্ভব সংখ্যা পরিহার করবেন;
- উক্তি দিলেও উদ্ধৃতিচিহ্ন দেবেন না। [যেমন—'বন্দি-মৃত্যুতে শাস্তি পাবে পুলিশ ঃ বুদ্ধ']

হেডলাইনের ব্যাপারে আর একটি কথা না বললেই নয়। তা হল, একালে সাংবাদিক-সংরূপের

বিশুদ্ধতা পত্র-পত্রিকায় ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে না। একজন কমপ্লিট ফুটবলার যেমন একালে সব পজিশনেই খেলতে পারেন তেমনি আধুনিক সাংবাদিকেরা মনে করেন জার্নালিস্টিক জেন্‌র-এর কথা না ভেবে সাংবাদিকের লেখাটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিলেই চলবে। এক্ষেত্রে রিপোর্ট, রিপোর্টাজ, নিউজ আইটেম, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকীয় ইত্যাদি বিভিন্ন সংরূপের বৈশিষ্ট্য ভেবে হেডলাইন ঠিক করার কোন মানে হয় না। ধ্রুপদী দৃষ্টীভঙ্গির বদলে সাংবাদিকতাতেও এসেছে আজ আধুনিকতার ঢল। তাই একালের সাংবাদিকের লেখনীতে হেডলাইনের বিশুদ্ধতা বিলীয়মান। তাঁদের কলমে যাবতীয় সীমানা ভেঙে চৌচির। লক্ষ্য সকলের একটাই—গ্রাহকসংখ্যা বাড়াও, পাঠকের মন জয় করো, বিজ্ঞাপনের আলোয় ঝলমল করুক পত্রিকা এবং মুনাফার স্বর্গে পৌঁছে দাও নিজের প্রতিষ্ঠানকে।

১২০.৪ সারাংশ

খবর দেওয়া-নেওয়া অর্থাৎ সংবাদ শ্রবণ-দর্শন-পঠন-পরিবেশনের ব্যাপারটা দীর্ঘকালের। একালের মানুষের কাছে তো তা একরকম চলমান সভ্যতার নামান্তর। প্রতিবেদন হল যাবতীয় সাংবাদিক- সংরূপের মধ্যে অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এর মাল-মশলা জোগাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে যেমন মেনে চলতে হয় অনেক কিছুই, তেমনি প্রতিবেদন রচনাকালে প্রতিবেদকের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়ভাবে ফুটে ওঠা দরকার—সেটাও খেয়ালে রাখা জরুরি। বলাইবাহুল্য বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য, রচনার অবলম্বিত পদ্ধতিও আলাদা আলাদা।

১২০.৫ অনুশীলনী

ক. ছোট প্রশ্ন [প্রতিটির মান ১ নম্বর]

১। সাংবাদিকতা শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করুন।

২। ‘সংবাদ’ শব্দটির চারটি প্রতিশব্দ লিখুন।

৩। Journalism-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?

৪। News-শব্দটির N, E, W, S-হরফগুলি কোন্ কোন্ অর্থের কথা বোঝায়?

৫। সাংবাদিকতার কাজটি খুবই সহজ, না জটিল?—এক কথায় উত্তর দিন।

খ. মাঝারি প্রশ্ন [প্রতিটির মান ৪/৫ নম্বর]

১। Journalism শব্দটি কীভাবে এসেছে? ৪/৫টি বাক্যে লিখুন।

২। কোন্ ইংরেজি শব্দের পারিভাষিক রূপ 'সংবৃপ'? সেটি কীভাবে এসেছে?

৩। সাংবাদিক-সংবৃপ বিচারের যে-তিনটি মান রয়েছে তা কী কী?

৪। নিউজ-আইটেম কাকে বলে?—৩/৪টি বাক্যে লিখুন।

৫। সংবাদচুম্বক কাকে বলে? ৪/৫টি বাক্যে একটি উদাহরণ দিন।

৬। প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কাকে বলে? ৩/৪টি বাক্যে লিখুন।

৭। রিপোর্টাজ বলতে কী বোঝেন তা তিন-চারটি বাক্যে লিখুন।

গ. বড় প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৮ থেকে ১০ নম্বর]

১। কোনো খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। সেই খবর জানিয়ে সংবাদপত্রের উপযোগী একটি শোকসংবাদ তৈরি করুন।

২। কেরোসিন তেল সংগ্রহের জন্য দোকানের সামনে বিশাল লাইন পড়েছে। সেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করুন। ১০টি বাক্যে।

৩। রচনার শিরোনাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করে ১০টি বাক্যে শিরোনাম বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করুন।

৪। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনামের কাজ কী কী? কয়েকটি বাক্যে লিখুন।

৫। প্রতিবেদন বা রিপোর্টের শিরোনাম দেবার সময় প্রতিবেদককে কী কী খেয়াল রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৬। নিচে কয়েকটি প্রতিবেদন দেওয়া হল। প্রত্যেকটি প্রতিবেদনের নিচে বন্ধনীর মধ্যে একাধিক বিকল্প শীর্ষনাম দেওয়া হল। প্রতিবেদনগুলি পড়ে উপযুক্ত শিরোনাম বেছে নিন। কেন এই শিরোনাম নির্বাচন করেছেন তার উপযুক্ত কারণ দেখান।

● **নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ১৩ই সেপ্টেম্বর**—বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল ১০টি শিশু মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত চলছে। শুক্রবার মৃত শিশুদের পরিবারবর্গের সঙ্গে কথা বললেন অনুসন্ধানকারী দলের অন্যতম সদস্য রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ প্রভাকর চ্যাটার্জি। শুক্রবার বিধাননগরে স্বাস্থ্য ভবনে এসেছিলেন মৃত শিশুদের মা-বাবা, পরিবার-পরিজন। ৭টি পরিবার এদিন আসে। বাকি ৩টি পরিবারের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ হয়নি। হাসপাতালের নথিপত্র থেকে জানা গেছে, এই ৩টি পরিবারের মধ্যে ২টি পরিবার কলকাতাতেই থাকে। তাই এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিসকে জানানো হয়েছে, সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এই ৩টি পরিবারের সঙ্গে কথা বলা হবে আগামী সোমবার।

প্রসঙ্গত, এ মাসের একেবারে শুরুতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০টি শিশুর মৃত্যু হয়। তারপরই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঐ ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, চিকিৎসার গাফিলতির কারণে কোন শিশুর মৃত্যু হয়নি। এমনকি শিশুদের মৃত্যুর কারণ কোন ধরনের সংক্রামক বা জীবাণুবাহিত রোগও নয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী বি সি রায় শিশু হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। তাঁরা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসাররা প্রায় দেড় ঘণ্টা ঐ হাসপাতালে কাটান। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, কর্মী এবং চিকিৎসারত শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরদিনই মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শিশুমৃত্যুর ঘটনায় আরও বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ প্রভাকর চ্যাটার্জি এবং চিকিৎসা-শিক্ষা অধিকর্তা অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি এই তদন্ত করছেন। তাঁরা দু'জনেই গোটা সপ্তাহ ধরে বি সি রায় শিশু হাসপাতালের সুপার, চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। বিশেষ করে ১লা এবং ২রা সেপ্টেম্বর যাঁরা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তকারী দলের দুই অফিসার কথাবার্তা বলেছেন ঐ হাসপাতালে চিকিৎসারত শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গেও।

মৃত শিশুদের পরিবারবর্গের সঙ্গে তদন্তকারী অফিসাররা কথা বলবেন—এটা আগে থেকেই জানা ছিল। ফলে সাংবাদিকরা একবার মহাকরণ, একবার বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ছোটাছুটি করেন। কিন্তু পুলিসের পরামর্শমতো বিধাননগরে স্বাস্থ্য ভবনে আয়োজন করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের। উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলী এবং হাওড়া এই তিন জেলা থেকে বেলা ১২টার মধ্যেই চলে আসেন কাকলি মজুমদার, মঞ্জু দে, রাজা গুপ্ত, ইশা সাহা পোদ্দার। চন্দা দাস আসতে পারেননি। তিনি তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠান। হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি'র মাঝে বাকি ২টি পরিবারের নাম পাওয়া যায়নি। দীর্ঘক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্য সচিব।

জানা গেছে, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা এবং অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবহার নিয়ে কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন। স্বাস্থ্য সচিব এদিন এ সংক্রান্ত সাংবাদিকদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। কি কথা হলো অভিভাবকদের সঙ্গে? এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি তিনি। শুধু জানিয়েছেন, 'আগামী সপ্তাহে আমরা আমাদের রিপোর্ট দিয়ে দেব। তারপর যা বলার রাজ্য সরকারই বলবে।'

[(i) শিশুমৃত্যু ঃ অভিভাবকদের সঙ্গে কথা তদন্তকারীদের; (ii) তদন্ত চলছে; (iii) শিশুমৃত্যু ঃ মূলে অবহেলা; (iv) স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে, তাই শিশুমৃত্যু।]

● **বিশেষ সংবাদদাতা : হায়দরাবাদ :** হাইটেক প্রযুক্তির রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে বেআইনী অঙ্গ কেনা-বেচার ঘটনা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। প্রশাসনের একাংশের মদতেই অবাধে চলছে কিডনি পাচার। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কমিটির দিকে। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের একটি ইংরাজী দৈনিক ফাঁস করেছে ঐ কিডনি পাচার চক্রের কর্মকাণ্ড। এই খবরের কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি রাজ্য সরকার। এমনকি অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কমিটির কাছেও কৈফিয়ৎ তলব করেনি রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ। বরং সরকার পরোক্ষে এই বেআইনী ব্যবসার বৈধতা মেনে নেওয়ায় মানুষের ক্ষোভ আরও তীব্র আকার নিয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ ও মাথাপিছু আয়ের বিষয়টি মোটেই আশাপ্রদ নয়। কৃষিব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। কৃষক ও দিনমজুরদের ঘরে ঘরে খাদ্য সঙ্কট খুবই তীব্র। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র পরিবারের মানুষেরা যে অর্থের লোভে কিডনি বিক্রির মতো কাজকে প্রাধান্য দেবে সে কথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি রাজ্যের মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের ডিরেক্টর ডাঃ সার এস রমাদেবী তাঁর দপ্তরের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েই জানিয়েছেন যে, গোটা ব্যাপারটাই ধোঁয়াশাপূর্ণ। বহু ক্ষেত্রেই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রির খবর আমাদের কাছে আসে না। বেশিরভাগ জায়গায় ভুয়ো শংসাপত্র দেখিয়ে বেসরকারী নার্সিংহোমগুলিতে কিডনি প্রতিস্থাপনের কাজ চালানো হচ্ছে। অথচ ঐ সমস্ত শংসাপত্রের বৈধতা পরীক্ষা করার মতো কোনো নির্দেশনামা আমাদের হাতে নেই। হিসাব অনুযায়ী গত তিন বছরে অন্ধ্রপ্রদেশে বেআইনীভাবে অন্তত ৫০০টি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করা হলেও এ ব্যাপারে বে-আইনী কাজ-কারবার রদ করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে কোনো কথাই সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি বেসরকারী যে সমস্ত সংস্থা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে তাদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না সে কথাও আইনে উল্লেখ করা হয়নি।

সম্প্রতি ঐ কমিটির কাজে গতি আনতে ও দুর্নীতি রুখতে বেসরকারী হাসপাতালের কয়েকজন প্রতিনিধিকে এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি বদলায়নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে কমিটির সদস্যদের অযোগ্যতা ও অর্থলোলুপতাকে ঘিরে। এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বার বার রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই কার্যকরী হয়নি। কারণ দুর্নীতির গভীরতা এত বেশি যে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বহু কর্তাব্যক্তিও ফেঁসে যেতে পারেন।

[(i) প্রদীপের নিচেই অন্ধকার; (ii) অন্ধ্রে প্রশাসনের মদতেই চলছে কিডনি পাচার; (iii) কিডনির সাতকাহন; (iv) কিডনিও কিডন্যাপড।]

● **স্টাফ রিপোর্টার, খোয়াই, ২৬ অক্টোবর**—পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খোয়াই শহরের কাছে চম্পাহাওড় এলাকায় একটি যাত্রিবাহী জিপের উপর আজ জঙ্গিরা হামলা চালালে এক শিশু ও তিন মহিলা-সহ আটজন নিহত হয়েছেন। নিহতেরা সকলেই বাঙালি। জখম হয়েছেন ন'জন। শনিবার সকাল আটটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। নির্বিচারে হত্যালীলা চালিয়ে জঙ্গিরা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশের মতে অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্সের (এ টি টি এফ) জঙ্গিরা এই হামলার পিছনে রয়েছে। ঘটনার ঘন্টাখানেক পরে আধাসামরিক বাহিনী পৌঁছে শুধু মৃতদেহগুলি আনতে পেরেছে। এর প্রতিবাদে রবির খোয়াই মহকুমায় ১২ ঘন্টার বন্ধ ডেকেছে সি পি এম।

আগরতলা থেকে প্রায় ১১২ কিলোমিটার দূরে বড়টিলা নামে এক জনহীন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ওই রাস্তায় যানবাহন বলতে শুধু জিপ। মানুষকে খোয়াই আসতে হয় জিপে গাদাগাদি করে। এ দিন নিখিল রায় তাঁর জিপে ঠাসা যাত্রী নিয়ে খোয়াই আসছিলেন। নিখিলবাবু জানালেন, প্রথমে একটি টিলার উপর থেকে জঙ্গিরা জিপ লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন যাত্রী মারা যান। একই সঙ্গে জিপের পিছনের ডানদিকের চাকাও গুলি লেগে ফেটে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জিপটি ডানদিকে উল্টে পড়ে। জঙ্গিরা তখন টিলা থেকে নেমে এসে গাড়িটির উপর আবার গুলি চালায়। তারপর তারা বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায়।

বি এস এফের এক অফিসার জানালেন, নির্বাচনের আগে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই জঙ্গিরা এই হামলা চালিয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার এখানে ওখানে চাপ চাপ রক্ত ছড়িয়ে আছে। একটি ছাগলও মরে পড়ে আছে। তার গায়েও গুলি লাগার চিহ্ন স্পষ্ট। টিলার উপরে ও রাস্তায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস, সি আর পি এফ ও বি এস এফের জওয়ানেরা পাহারা দিচ্ছেন। মৃতদেহগুলি আধাসামরিক বাহিনীর একটি ট্রাকে তোলা হয়েছে। জঙ্গিরা এ কে সিরিজের রাইফেল ব্যবহার করেছিল। এই নিয়ে চলতি মাসে জঙ্গিরা নিরাপত্তা রক্ষী ও সাধারণ মানুষ সমেত মোট ১৭ জনকে হত্যা করল। ৯ অক্টোবর এন এল এফ টি জঙ্গিরা ধলাই জেলায় ৯ জন জওয়ানকে মারে। ২০ অগস্ট পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হিরাপুরে একই গোষ্ঠীর জঙ্গিদের হামলায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (টি এস আর) ২০ জওয়ান নিহত হন। ২৬ জুলাই পশ্চিম ত্রিপুরায় টি এস আরের ৬ জওয়ান-সহ আট জন মারা যান। ২৬ এপ্রিল ও ১৩ মার্চ এন এল এফ টি জঙ্গিরা যথাক্রমে ৮ ও ১৩ জনকে গুলি করে মারে। ১৩ জানুয়ারি এ টি টি এফের হামলায় ১৬ জন নিহত হন।

[(i) জঙ্গিদের কবলে ত্রিপুরা; (ii) ত্রিপুরা অগ্নিগর্ভ; (iii) ত্রিপুরায় জঙ্গি হানা ঃ শিশু, মহিলাসহ নিহত আট; (iv) ত্রিপুরায় জঙ্গি হানা অব্যাহত।]

● এক ব্যক্তিকে চোর সাজিয়ে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বেনিয়াপুকুর থানার ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিটের ৫৫ বছরের সেবাস্টিয়ান টেসরার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় সোমবার। তিনি অ্যাসিড খেয়েছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছেন। ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, পাড়ায় টেসরা ৫০ বছর ধরে বাস করছিলেন, সেখানকারই কিছু বাসিন্দা তাঁর নামে চুরির অপবাদ দিচ্ছিলেন। ওই অপবাদের জ্বালা সইতে না পেরেই ওই ভদ্রলোক অ্যাসিড খেয়েছিলেন কি না তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের মায়ের অভিযোগ পেয়ে প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ মুন্নি বেগম, চুন্নি বেগম এবং মহম্মদ ছোটু নামে তিনজনকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে।

গত সোমবার ওই ব্যক্তি হাসপাতালে মারা যান। মারা যাওয়ার আগে ভাগ্নে নোয়েল মাইকেলকে বলে যান, ‘‘বিশ্বাস করো, আমি চুরি করিনি।’’ পুলিশকে তা জানিয়েছেন মাইকেল এবং মৃতের মা। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পাড়ার লোকেরা কিন্তু টেসরার পরিবারের অভিযোগ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। ওই মৃত্যুর সঠিক তদন্ত চেয়ে এলাকায় পোস্টারও পড়েছে। ডি সি (ই এস ডি) সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ওই এলাকায় একটি বাড়িতে অল্প কিছু তার চুরি যাওয়ার পরে টেসরার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ওই বাড়ির লোকেরা। অন্য দিকে টেসরার আত্মীয়েরা জানান তিনি চুরি করেননি।’’

ডি সি বলেন, ‘‘যাঁদের জিনিস চুরি হয়, তাঁরা জানান চুরির কথা স্বীকার করেছিলেন টেসরা। ৫০০ টাকার বিনিময়ে তিনি সেই তার বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন অভিযোগকারীরা। আমরা তদন্ত করে দেখছি কোন্ বক্তব্যটি ঠিক? তবে, টেসরা যে চোর, তার কোও নথি পুলিশের খাতায় নেই।’’ সঞ্জয়বাবু বলেছেন, ‘‘টেসরাকে যে মারধর ও অপমান করা হয়েছে তার প্রমাণ পুলিশের কাছে এসেছে। মনে করা হচ্ছে, এই অপমানের জন্যই তিনি মিউরেটিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।’’

বৃহস্পতিবার টেসরার দিদি দীপালি পিটার বলেন, ‘‘ছোট থেকে ও এখানেই থাকত। দু’বছর আগে ঠাকুরপুকুরে চলে গিয়েছে। তবে, ১০ বছরের ছেলে ভিক্টরকে স্কুলে ছাড়তে সে রোজই এখানে আসত।’’ এক সময়ে বন্দরে শ্রমিকের চাকরি করতেন টেসরা। সেই চাকরি চলে যাওয়ার পর তিনি ছুতোরমিস্ত্রির কাজ করতেন। দিদির পাশের বাড়ি মুন্নি বেগমদের বাড়িতেও সে কখনও ছোটখাটো কাজ করছেন। গত শুক্রবার তাঁকে মুন্নি বেগমের বাড়ি থেকে ডেকে পাঠানো হয়। টেসরা সেখান থেকে ফিরে আসার পরে মুন্নি বেগমের বাড়ির লোকেরা দেখেন, ব্যাগে রাখা কিছু তার পাওয়া যাচ্ছে না। তখন থেকেই তাঁদের সেবাস্টিয়ানের উপরে সন্দেহ হয় বলে মনে করছে পুলিশ।

দীপালিদেবীর অভিযোগ, “সোমবার টেসরা ছেলেকে স্কুলে দিয়ে দিদির বাড়িতে এলে তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। মারধর করে মুন্নিরা।” এর পরে তিনি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে তাঁকে পিছন থেকে ‘চোর-চোর’ বলে তাড়া করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানায়, কাছেই একটি মুদির দোকানের মালিককে কিছু বুঝতে না দিয়ে টেসরা সেখান থেকে একটি অ্যাসিডের বোতল তুলে গলায় ঢেলে দেন।

[(i) আত্মহত্যায় প্ররোচনা ঃ গ্রেফতার তিন; (ii) অস্বাভাবিক মৃত্যু; (iii) ‘চোর’ সাজানোয় আত্মহত্যা, ধৃত তিন; (iv) চোর অপবাদে আত্মহত্যা।]

১২০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Alfred Jahnke : *THE JOURNALIST GENRES.*

২। Julius Waldschmidt : *JOURNALISTIC GENRES AND THEIR USE IN RADIO.*

৩। H. W. Steed : *THE PRESS.*

৪। Sumanta Banerjee : *INDIA’S MONOPOLY PRESS.*

৫। পার্থ চট্টোপাধ্যায় : *গণ-জ্ঞাপন*।

৬। Vladimir Hudec : *JOURNALISM.*

৭। M. Chalapathi Rau : *THE PRESS.*

৮। Alfred Jahnke : *THE HEADLINE.*

একক ১২১ ❑ প্রতিবেদন রচনা

গঠন

১২১.১ উদ্দেশ্য

১২১.২ প্রস্তাবনা

১২১.৩ মূলপাঠ

১২১.৪ প্রতিবেদনের নমুনা

১২১.৫ সারাংশ

১২১.৬ অনুশীলনী

১২১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১২১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আপনি যত্ন-সহকারে কয়েকবার পড়ুন। তাহলেই আপনি জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন, এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।

- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাংবাদিক-সংরূপ অর্থাৎ Journalistic Genre প্রতিবেদন বা Report কাকে বলে।
- প্রতিবেদন পরিভাষাটি যে মূল শব্দের অর্থ বহন করে তৈরি হয়েছে তার উৎস কোথায় সেটি জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদন শব্দের নানা অর্থও আপনি জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদকের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে তা আপনি এখানে বুঝতে পারবেন।
- প্রতিবেদকের কর্মপদ্ধতিকে কোন্ কোন্ পর্যায়ে ভাগ করা যায় তা এই একক থেকে আপনি জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি কী—তা আপনি জানতে পারবেন।

- প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি কী, তাও আপনি এই একক থেকে জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদন তৈরির সময় প্রতিবেদক হিসাবে আপনি কী কী মেনে চলতে পারেন, বরং বলা যায় মেনে চললে ভালো হয় সে সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন।
- প্রকাশিত প্রতিবেদনের দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে আপনি আপনার আহৃত জ্ঞানকে প্রতিবেদন রচনার সময় কাজে লাগাতে পারবেন।

১২১.২ প্রস্তাবনা

যেদিক থেকেই আমরা বিচার করি না কেন, মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি হল প্রাথমিকভাবেই খিদে মেটানো। টিকে থাকার জন্যে ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবৃত্ত করাই তার প্রথম লক্ষ্য। এর জন্যে মানুষ করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবৃত্ত করার মতোই আর যে-একটা প্রবল তাগিদ মানুষ ভীষণভাবে অনুভব করে সেটি হল খবরের খিদে মেটানো। বস্তুত মানবজাতির অস্তিত্বের মতোই প্রাচীন হল তার সংবাদ-অন্বেষা। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও কোন্‌খানে শিকারের পশু পাওয়া যাবে, কেমন করে তার পশ্চাদ্ধাবন হবে, কীভাবে দু-তিন জন মিলে বড় বড় প্রাণীকে খতম করা যাবে—সেই সংবাদ হত বিনিময়। এর বহু প্রমাণ রয়েছে উত্তর আফ্রিকার প্রস্তরচিত্রণ ও গুহাঙ্কনের মধ্যে।

সভ্যতার ঊষাকালে মানুষে-মানুষে সংবাদ সরবরাহ বা যোগাযোগের উপায় ছিল মূক-বধিরদের মতো ইশারার ভাষা বা ইঙ্গিত-ভাষা; পাহাড়ে, বালিতে কিংবা মৃত্তিকায় অঙ্কিত ভাষা। এখনও ঠিক নিশ্চিতভাবে বলা যায় নি, ঐ সময়ে একে অপরের কাছে নিজেকে বোঝানোর জন্য কতদূর পর্যন্ত মানবিক ভাষা ব্যবহার করত বা হত। যদিও আজ আর আমাদের অজানা নেই যে ভাষা হচ্ছে মনের আয়না। তার মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি পরস্পরকে, বুঝতে পারি মনের অলি-গলি, ছুঁতে পারি ইচ্ছা-অনিচ্ছা-আবেগ-অনুভূতি। অবশ্য যতই মানুষ ভাষা তৈরি করুক, তার ক্রমাগ্রসরণ ঘটাক তবু ভাষা মনের অখণ্ড দর্পণ, না আংশিক আরশি—সে বিষয়ে অনেকেরই সংশয় পুরোপুরি ঘোচে নি। একথাও তো সত্য ভাষার মধ্যে রয়েছে অবয়তত্ত্ব, স্বোপার্জন তত্ত্ব ও ব্যবহারিক তত্ত্ব।

যাই হোক, খাদ্যের মতোই মানুষের জীবনে সংবাদের প্রয়োজনীয়তা একান্ত বাস্তব ও অনিবার্য সত্য। জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে সেই সংবাদের চাহিদা পূরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই মানুষের। যুগ যুগ ধরেই সংবাদের চাহিদা যেমন প্রতিষ্ঠিত সত্য তেমনি তার তীব্রতাও ঊর্ধ্বমুখী। আধুনিক মানুষ তো আধুনিকই নন সংবাদ ছাড়া। এমন কি মানবসভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলিও তো সেকালের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ও সংবাদই নিরন্তর পৌঁছে দিয়েছে, দিচ্ছে, দেবে হাজার-হাজার বছরের পরবর্তী

উত্তরসূরিদের কাছে। তাই মানুষ যেমন খাদ্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, তেমনি মানুষ মানুষ ছাড়া, সংবাদ ছাড়া বাঁচতে পারে না। সংবাদের জন্য মানুষের এই অনিবার্য চাহিদা, নিরন্তর হাহাকারই সংবাদপত্রের উৎসে, গণমাধ্যমের প্রস্থানভূমি। প্রতিবেদন হল তার অন্যতম প্রধান অস্ত্র, সংবাদ সংরূপ।

১২১.৩ মূলপাঠ

এর আগে আপনি সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র হিসাবে প্রতিবেদনের সাধারণ পরিচয় পেয়েছেন। এখানে তার আর-একটু বিশদ পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে প্রতিবেদন রচনা করবেন তার-ও রূপরেখা দেওয়া হল।

একথা সত্য যে, আমরা এমন এক ঐতিহাসিক নজিরবিহীন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময়ে বসবাস করছি যখন আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলেছে বিশ্বজুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক মুখের বদল। সেই পরিবর্তন-সাধনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়েছে নিঃসন্দেহেই এক উজ্জ্বলতর, ব্যাপকতর ভূমিকা। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ঘটে গিয়েছে বিস্ময়কর বিস্ফোরণ। গোড়ার দিকে গণসংযোগের এই অগ্রগতি ধীর লয়ে সাধিত হলেও পরে তা আকাঙ্খিত গতিবেগ ও মাত্রা লাভ করে। অন্তত কেউ যদি মনে রাখেন যে কমবেশি পাঁচ লক্ষ বছর আগে মানুষ কথা বলা রপ্ত করে, চার হাজার বছর আগে শুরু করে লিখতে এবং পাঁচশো বছর আগে আবিষ্কৃত হয় মুদ্রণযন্ত্র, গণদূরদর্শন ষাট বৎসর পূর্বে, কমপিউটার প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে আর টেলিকমিউকেশন স্যাটেলাইট আসে ত্রিশ বছর আগে, তাহলে বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সত্যিসত্যিই যে জ্ঞাপন বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে তার প্রমাণ মেলে যখন আমরা জানতে পারি দেড়শো কোটির বেশি রেডিওসেট, পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো বেতারকেন্দ্র, পঞ্চাশ কোটি টিভি সেট, দেড়শোর বেশি নিউজ এজেন্সি, বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে, কিংবা কাজ করে চলেছে। এটাও আজ আর অজানা নেই যে গড়ে রোজই পৃথিবীতে সতেরোশ' নতুন নতুন বই বেরোচ্ছে এবং বছরে বিভিন্ন বইয়ের মোট প্রচারসংখ্যা আটশো কোটিরও বেশি। বিশ্বজুড়ে দৈনিক পত্রিকা বেরোয় প্রায় দশ হাজার এবং তার পাঠক কয়েকশো কোটি।

যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, এটাই বাস্তব সত্য যে মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সংবাদলাভের বিষয়টি, আর সেই খবর যেমন সাধারণ বিষয় নিয়ে হতে পারে তেমনি তা হতে পারে চিত্তপ্রকর্ষের, দৈশিকতার, রাষ্ট্রউদ্যমের বা জনাদর নিয়ে। গণমাধ্যম ঢুকে গিয়েছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একেবারে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও।

সেই গণমাধ্যমের, তা মুদ্রণই হোক কি বৈদ্যুতিনই হোক, অর্থাৎ সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন প্রভৃতিতে যে সাংবাদিক-সংরূপটি সবসময়েই ব্যবহৃত হয় তা হল প্রতিবেদন। আর প্রতিবেদন যিনি তৈরি করেন বা পাঠান তিনি হলেন প্রতিবেদক। এঁকে হতে হয় ক্ষিপ্রনিশ্চয়। তিনি যেমন প্রত্যক্ষবাদী তেমনি হন প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অবশ্য তাঁকেও মনে রাখতে হয় কোন গণমাধ্যমই নিছক সংবাদের অভিসমবায় নয়।

'প্রতিবেদন' শব্দটি একটি পরিভাষা। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করি—যেমন, 'অধিষ্ঠায়কবর্গের নিকট বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন প্রেরিত হইয়াছে'। 'প্রতিবেদন' শব্দটি ইংরেজি 'Report'-এর বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ। 'রিপোর্ট' শব্দটির শিকড় রয়েছে লাতিন re-portare-র মধ্যে। সেখান থেকে প্রাচীন ফরাসিতে হল reporteur, ইঙ্গ-ফরাসিতে reportour, তা থেকে ইংরেজিতে শব্দটি গৃহীত হয়েছে। রিপোর্ট শব্দটির অর্থ হল ফিরিয়ে আনা, আর রিপোর্টার বলতে বোঝায় যিনি রিপোর্ট করেন; সংবাদপত্র, বাক্‌প্রসার, দূরদৃশ্যধ্বনিবহ ইত্যাদির জন্য সংবাদের রিপোর্ট করেন যেসব চাকুরে। 'প্রতিবেদন' শব্দটি বিশেষ্য। অর্থ ঃ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনপত্র; রিপোর্ট। অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে, প্রতিবেদন শব্দটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নির্বাচিত। মানে হল ঃ বিবৃতি; সমাচার; বার্তা; বিবরণী report। পাশাপাশি 'প্রতিবেদক' শব্দের অর্থ 'সংঘটিত কার্য বা ঘটনার সংবাদদাতা reporter'।

তবে মুদ্রিত গণমাধ্যমে, নির্দিষ্টভাবে দৈনিক সংবাদপত্রে আপনি যে ছাপানো প্রতিবেদন পড়েন সেগুলো কীভাবে লেখা যায় বা তৈরি করা হয় তার দৃষ্টান্ত আমরা মূলপাঠে দিয়ে দিচ্ছি। পাশাপাশি আপনি পাবেন সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদনের সঙ্গে দূরদর্শন ও আকাশবাণীর জন্য তৈরি প্রতিবেদনের পার্থক্যটা কোথায়।

একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, সংবাদপত্রের যে-দুটি সংরূপের প্রতি পাঠকদের দুর্বলতা, ভালোবাসা বা নিন্দা, বিতর্ক সোচ্চার সে দুটি হল নিউজ আইটেম ও রিপোর্ট। অন্যান্য সংরূপের গুরুত্ব সামান্য খর্ব না করেও বলতে হবে এই সংরূপদুটির সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর সংবাদপত্রের জনাদর অনেকখানি নির্ভর করে। বস্তুত, সংবাদের দুটি ডানা—তার একটি নিউজ আইটেম, অন্যটি রিপোর্ট।

সবরকম সংবাদ সংগ্রহের কাজ যাঁরা করেন তাঁদের বলে প্রতিবেদক বা রিপোর্টার। মূলত এঁরা রাজধানী, শহর বা শহরের কাছাকাছি এলাকার খবর জোগাড় করেন। আবার অনেকের জন্য নির্দিষ্ট স্থানও থাকে। বিষয়কেন্দ্রিকতায়-ও রিপোর্টার আলাদা আলাদা হতে পারেন। কেউ যেমন কভার করতে পারেন কলকাতাস্থিত মহাকরণের সংবাদ, কারও ওপর দায়িত্ব থাকতে পারে আইন-আদালত-পুলিশী

রিপোর্ট। কেউ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিদ্যালয়ের অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট কভারের দায়িত্ব পান তেমনি কারও ওপর দায়িত্ব বর্তায় বিভিন্ন দূতাবাসের খবর জোগাড় করে প্রতিবেদন রচনার। তবে রিপোর্টার বা প্রতিবেদক স্থানীয় এলাকাতেই কাজ করুন বা দূরদেশেই কাজে যান, তাঁর দায়িত্ব মোটামুটি একইরকম। প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে যেতে হবে, খবর সংগ্রহ করতে হবে এবং তা থেকে কাহিনী বা প্রতিবেদন তৈরি করে নিজের প্রতিষ্ঠানে ছাপানোর জন্যে পাঠাতে হবে। সম সময়েই যে কাহিনী মিলবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বা সব কাহিনীই যে ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, সেটাও ঠিক নয়। তবে প্রতিবেদককে অসীম ধৈর্য ধরতে হয়, বিচক্ষণ হতে হয়। পরিশ্রমী, কৌতূহলী, সুনিপুণ কর্মী তো হতেই হবে। তিনি সংবেদনশীলও হবেন। মনে রাখতে হবে, একালে প্রতিবেদকের কাজ বেশ প্রতিযোগিতামূলক। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের প্রখরতা না থাকলে সফল প্রতিবেদক হওয়া খুবই কঠিন। সেজন্যে একটা কথা রিপোর্টারদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাঁরাই হলেন সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তার আসল কারিগর। কেউ কেউ মনে করেন, একজন বুদ্ধিমান প্রতিবেদক একজন বিবেচক সম্পাদকের চেয়েও অনেক বেশি দামি সংবাদপত্রে।

আপনি যদি একজন ভালো প্রতিবেদক হতে চান তাহলে আপনার মধ্যে কম করেও যে-যে বিশেষত্ব অনেকেই খুঁজবেন সেগুলো হল—

- ভালোরকম বুনিয়াদি শিক্ষা,
- চটপটে ভাব বা স্মার্টনেশ,
- স্বচ্ছ চিন্তা করার অধিকার,
- সহজ-সরল-প্রাঞ্জলভাবে অর্থাৎ ঝরঝরে লেখার দক্ষতা,
- সততা,
- নির্ভরযোগ্যতা,
- না-ছোড়বান্দা মনোভাব,
- প্রীতিপ্রদ ব্যক্তিত্ব।

যেহেতু প্রতিবেদকেরা মূলত যে শহর বা এলাকা থেকে কাগজটি বেরোয় সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাই প্রত্যেক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানেরই থাকে নিজস্ব সংবাদদাতা, যাঁরাও আসলে একধরনের কেন পুরোপুরি রিপোর্টারই। এঁরা প্রধানত কাজ করেন শহরতলিতে বা ভিন্ রাজ্যে, দূরবর্তী অঞ্চলে। এঁরা সাধারণত সংবাদ পাঠান দূরধ্বনিবহনযোগে, টেলিপ্রিন্টারে, ফ্যাক্সে, ডাকযোগে, ই-মেলে, ইন্টারনেটে। স্যাটেলাইটেও সংবাদ আসে। নিজস্ব সংবাদদাতাদের মতো থাকে বিশেষ সংবাদদাতা, নিজস্ব

প্রতিনিধি, বিশেষ প্রতিনিধি প্রমুখ। এভাবেই শহরতলির সংবাদদাতা, রাজ্য ও জাতীয় সংবাদদাতা, মুম্বাই-চেন্নাই-দিল্লি-মস্কো-ওয়াশিংটন-প্যারিস-লন্ডনের প্রতিনিধি, যুদ্ধের সংবাদদাতা ইত্যাদি। সংবাদ এসে পৌঁছায় আরো একাধিক সূত্র থেকে। নিউজ এজেন্সি, দূরদর্শন, আকাশবাণী থেকেও সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণ কোনও কোনও প্রতিবেদন বা সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন। এ-ব্যাপারে স্বেচ্ছাকর্মীদের ভূমিকাও নগণ্য নয়।

প্রতিবেদকের কর্মপদ্ধতিকে অনেকগুলি সূক্ষ্ম স্তরে ভাগ করা গেলেও মোটা দাগে চার পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত বা বিন্যস্ত করা চলে। অবশ্য সর্বত্রই যে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা নয়। কোনও কোনও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান নিজেদের সুবিধামতো পর্যায়গুলো ভাগ করে নেন, করেন কাজের বিলিবণ্টন। দায়িত্বও ভাগ করে দৈনন্দিন কাজ চালান। তবে যে-কটি স্তরে প্রতিবেদকের কাজ ভাগ না করলেই নয়, সেই পর্যায়গুলি এভাবেও বিন্যস্ত করা যেতে পারে।—

প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমত ঘটনাস্থলে উপস্থিতি
↓
সংবাদসংগ্রহ
↓
তথ্যবাছাই [প্রমাণসহ]
↓
পরিবেশন বা বিতরণ ভাবনা
↓
প্রতিবেদন বা কাহিনী নির্মাণ

সাধারণভাবে প্রতিবেদককে প্রথমে আসতে হয় নিজের কর্মস্থলে অর্থাৎ সংবাদপত্রের দপ্তরে। সেখান থেকে চীফ রিপোর্টার বা বার্তা সম্পাদক বা ভারপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তি প্রতিবেদককে জানান তাঁর ডিউটি অর্থাৎ কোথায়, কখন, কোন্ ঘটনা বা বিষয় নিয়ে তাঁকে রিপোর্ট লিখতে হবে। এই নির্দেশ ঘটনার পূর্বদিনেও জানিয়ে দিতে পারেন, যদি প্রতিবেদনে বর্ণিতব্য বিষয় বা ঘটনাটি পূর্বনির্ধারিত হয় (যেমন পূর্বনির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলন, সভাসমিতি, কোনও কিছুর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ইত্যাদি)। জরুরি কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটলে টেলিফোনেও প্রতিবেদকের কাছে ঘটনাস্থলে যাওয়া ও তা কভার করার নির্দেশ যেতে পারে। ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই তৈরি হয়ে নিতে হয় প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে যাবার জন্য এবং তা করতে হয় অবশ্যই ঘটনার চরিত্র ও গুরুত্ব অনুসারে।

এবারে প্রতিবেদক যাবেন ঘটনাস্থলে। প্রয়োজনে সঙ্গে যাবেন ফটোগ্রাফার। রিপোর্টার ঘটনাস্থল থেকে যা যা পারবেন তথ্য সংগ্রহ করবেন, নিজে যা যা দেখলেন নোট্ করে নেবেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের

বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নেবেন, ঘটনা অনুসারে সরকারি বা প্রশাসনিক ব্যক্তিদের মন্তব্য সংগ্রহ করবেন। এরপরে চলে আসবেন নিজের প্রতিষ্ঠানে। সেখানে চলবে তাঁর তথ্য ঝাড়াই-বাছাই। এই কাজটা শেষ হলে আসে সংবাদটা কীভাবে পরিবেশন বা বিতরণ করবেন তার ভাবনা। সেই ভাবনার ফসল হবে প্রতিবেদনটি বা 'স্টোরি'টি। প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের মন্তব্য জুড়ে দিলে অনেক সময়েই প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠতা বিনষ্ট হয়, পাঠকদেরও নিজস্ব মতামত তৈরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তবে সংবাদপত্রে আজকাল প্রতিবেদনও মন্তব্যহীনভাবে বিশেষ প্রকাশিত হয় না। সেই মন্তব্য কখনও হেডলাইনের মধ্যে উঁকি মারে, আবার কখনও কখনও তা মুদ্রিত প্রতিবেদনের অভ্যন্তরেই নগ্নভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু প্রতিবেদন রচনার প্রথাসিদ্ধ নিয়ম হল তথ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে মন্তব্য প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের জন্য সুরক্ষিত রাখা।

প্রতিবেদন তৈরির সময়ে প্রতিবেদককে খুবই সচেতন ও দায়িত্ববান থাকতে হয়। অন্ততঃ প্রতিবেদকের কাছে সেটাই অভিপ্রেত। সংবাদের তথ্যে যাতে কোনভাবেই বিকৃতি না ঘটে, সেটা খেয়াল রাখা খুবই জরুরি। সততা ও সাহসিকতা হচ্ছে প্রতিবেদকের মেরুদণ্ড। তার সঙ্গে চাই ভাষাজ্ঞান ও শিল্পশৈলী। প্রতিবেদনের ভাষা হবে জীবন্ত। তা হবে বাস্তবধর্মী, সর্বজনবোধ্য অথচ শিল্পিত। এলিয়ে পড়া ভাষাভঙ্গি পাঠককে ঘুম পাড়ায়। কাজে কাজেই ভাষার মধ্যে বলিষ্ঠতাও যেন ছড়িয়ে দেয় হীরের দ্যুতি—এটা নজর রাখতে হবে প্রতিবেদককেই। অকারণ বাগ্‌বিস্তার প্রতিবেদনে পরিত্যাজ্য। চটুল ভাষা প্রয়োগের সময় দেখতে হবে ভাষার সুর কেটে যাচ্ছে কিনা। একই কথা খাটে গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দের আধিক্য ঘটালে। মনে রাখতে হবে, সংবাদপত্রের পাঠক আর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের পাঠক এক নন। অপশব্দের প্রয়োগ রুচিহীনতার পরিচায়ক, এটাও খেয়ালে রাখা দরকার। প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদককে সব সময়েই জানান দিতে হবে যে রিপোর্টার সমাজের বিবেক, গণতন্ত্রের প্রহরী। তিনি নির্ভীক, বস্তুনিষ্ঠ ও শিল্পী। কাউকে আঘাত দেওয়া প্রতিবেদকে মানায় না, তা তাঁর কাজের মধ্যেও পড়ে না। ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক সংবাদ; যৌন-উত্তেজনা সঞ্চারক সন্দেশ; মাদকসেবনে উৎসাহবর্ধক বা মানসিক বিকৃতি জাগায় বা ছড়ায় এমন খবরও প্রতিবেদনে জায়গা পাওয়া উচিত নয়। গুজব ছড়ানো থেকেও তিনি নিজেকে বিরত রাখবেন। 'একান্ত ব্যক্তিগত' বা 'ছাপানোর জন্য নয়' এরকম কোনও সতর্কিত বা প্রতিশ্রুতি সংবাদ প্রতিবদনে প্রকাশ করা অনৈতিক। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়। উপরন্তু প্রতিবেদন রচনার-সময় প্রেস ল', দেশের বিচারব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান, দ্বন্দ্বসহ বস্তুনিষ্ঠ সমাজ-উন্নয়নের ধারা, নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দেশ-সমাজ-জাতির বিভিন্ন রীতিনীতি-ঐতিহ্য-আইনকানুন-পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন থাকা দরকার। দেশের নিরাপত্তা, জনগণের সংহতি-মৈত্রী-কল্যাণ-শান্তি বিনষ্ট হয় এমন কোনও খবরও প্রতিবেদনের

বিষয় হওয়া অনুচিত। বরং এধরনের সংবাদ সর্বথা পরিত্যাজ্য। বৃত্তি হিসাবে সাংবাদিকতার কিছু নিজস্ব নৈতিকতাবোধ থাকে, সেগুলি প্রতিবেদকের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। সর্বোপরি প্রতিবেদক হবেন সত্যাশ্রয়ী। চটকদারি সংবাদ পরিবেশন করে সমাজ ও জাতির স্থিতিশীলতা নষ্ট করার অধিকার কোনও প্রতিবেদকেরই নেই। তাঁকে হতে হয় সহিষ্ণু। আর প্রতিবেদককে মনে রাখতে হয়, সমস্ত প্রতিবেদনের মর্মবীজ হবেন মানুষ। হ্যাঁ, মানুষ, মানুষ আর মানুষই প্রতিবেদনের মর্মভাষা।

তাহলে, প্রতিবেদনের প্রধান কাজ কী? তা হল, সবে ঘটে গিয়েছে বা ঘটছে যে ঘটনা সে সম্পর্কে পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে তরতাজা বস্তুনিষ্ঠভাবে অবহিত করা। বাসি খবরে কোনও পাঠক-শ্রোতা-দর্শকেরই আগ্রহ থাকে না। সময়, দিন, স্থানে উল্লেখ করে সদ্য সংঘটিত ঘটনাকে বুদ্ধিদীপ্ত, পরিশীলত ও মনোরঞ্জন ভাষায় সত্যনিষ্ঠ থেকে পরিবেশন করতে পারলেই প্রতিবেদন হয়ে ওঠে বিশ্বস্ত, সুন্দর ও সাবলীল। তা তখন গ্রহণীয়, আস্বাদনীয় হয়। পরের মুখে ঝাল খেয়ে প্রতিবেদন লিখতে নেই। এতে সত্য রক্ষা পায় না। কাজেকাজেই প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে যেতে হয়, দেখতে-শুনতে-থাকতে হয়, বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করে শেষমেশ লিখতে হয় প্রতিবেদন। কেননা প্রতিবেদককে সব সময়েই বিবেচনা করা হয় প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে, ঘটনার সাক্ষীরূপে।

এবার সূত্রাকারে উল্লেখ করা যাক সেইসব বৈশিষ্ট্য যা প্রতিবেদনে অভিপ্রেত। তবে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যে সব প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে এমনটি আশা করা সমীচীন হবে না। বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রাসঙ্গিকতা
- সর্বজনীনতা
- বিশ্বাসযোগ্যতা
- দায়িত্বসচেতনতা
- বহুগুণতা
- সমকালীনতা
- তৎপরতা
- প্রাতিষ্ঠানিক চারিত্র্য

এর সঙ্গে আশা করা যেতে পারে প্রতিবেদকের অঙ্গীকার বা কমিটমেন্ট। তাঁর দেখার চোখ আলাদা, বিচার করার ষষ্ঠেন্দ্রিয় স্বতন্ত্র। বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব চেক-সাংবাদিক জুলিয়াস ফুচিক বলেছিলেন, ‘একটা ভালো রিপোর্টাজে থাকতে পারে কোনো ছোট্ট বাস্তব তথ্য, বর্ণসমৃদ্ধ

ঘটনা, কিন্তু তা ব্যতিক্রমী নয়। শুধুমাত্র তার থেকে আমার অনুপুঙ্খ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে এঁকে ফেলি জনগণের ছবি এবং ঘটনাটা। সেটাই রিপোর্টাজ। সেখানে ছোট্ট ঐ টিপিক্যাল তথ্যের খামতি থাকতে পারে। তবে চারদিকের ধূসর গতানুগতিক সাধারণ দিনগুলোর ভেতর থেকে রোজকার ঘটনাবলির ডাঁই ঘেঁটে বের করে নেবেন সেইসব তথ্যই যা আপনাকে টানবে, আর আপনি অনুভব করবেন বিশেষ মমত্ব। আর আপনি যদি রিপোর্টার হিসাবে নিজের বিচারবোধে ঠিক থাকেন, আপনি যদি নিজেকে নিছক লিখিয়ে হিসাবে বিচার না করেন তাহলে লক্ষ্য রাখবেন কীভাবে আপনার চারদিকের দুনিয়াটা বদলে যাচ্ছে।' বাস্তবিকই একজন প্রতিবেদক কীভাবে ঘটনাকে দেখছে তার ওপরও নির্ভর করে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে একজন রিপোর্টার বা প্রতিবেদকের অবস্থান।

এর আগে আপনি জেনেছেন নিউজ আইটেম বা রিপোর্ট তৈরির পদ্ধতি। তবু আর একবার সেসব কথা ঝালিয়ে নিতে পারি। অর্থাৎ আপনি যখন প্রতিবেদন লিখবেন তখন যে-যে প্রশ্নগুলি মনে মনে নিজেকে করবেন এবং তার উত্তর পর পর সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবেন, সেগুলিই উল্লেখ করছি পুনরায়। তা হল—

- কোথায় ঘটেছে?
- কবে ও কখন ঘটেছে?
- কে বা কারা ঘটিয়েছে?
- কী ঘটেছে?
- কীভাবে ও কেন ঘটেছে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর পর পর মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে প্রতিবেদন রচনা শুরু করলে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের চাহিদা আপনি পূরণ করতে পারবেন আশা করি। সঙ্গে সঙ্গে আপনার গ্রাহকদের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

বলাই বাহুল্য, প্রতিবেদনেরও রকমফের আছে। অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, বিশেষত্বে আছে অনেক হেরফের। একালে প্রতিবেদক আর একজন সাধারণ সংবাদ-জোগাড়ে নন। আসলে দুনিয়াটা যেমন বদলাচ্ছে তেমনি বর্তমান বিশ্বে সংবাদপত্রের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে অনেকখানি। বেশিরভাগ সংবাদপত্র হল মুনাফাবৃদ্ধির অভিজাত মাধ্যম। সংগ্রাম বা আদর্শের হাতিয়ার হিসাবে সংবাদপত্রের ভূমিকা মুনাফাশিকারীরা আজ আর স্বীকার করেন না, যদিও আমাদের দেশে এর সংখ্যা একসময় কম ছিল না। রাজনৈতিক দলের মুখপত্র, তা সে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক যাই হোক না কেন একদল উন্নাসিক সেগুলোকে সংবাদপত্রের মর্যাদা দিতে চান না। যদিও এইসব পত্রিকাও নিজেদের গন্ডি পেরিয়েও

জনগণের সংগ্রাম-শিক্ষা-অগ্রগতির কাজেই নিজেদের নিযুক্ত রাখছে। আদর্শের ক্ষেত্রে কোনওরকম সমঝোতা না করেও সংবাদকে সংবাদ হিসাবেই পরিবেশন করছেন। সংবাদপত্র আজ একধরনের মর্যাদাসম্পন্ন লাভজনক ইন্ডাস্ট্রি। এক্ষেত্রে চাকুরিজীবী সাংবাদিকেরও রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। বার্তাজীবীর দল মুনাফাবৃদ্ধির হাতিয়ার। তাঁদের লেখনী অধিকাংশ সময়েই নেয় বিশ্বস্ত সেবাদাসের ভূমিকা এবং কখনোই সেই লেখনী গাছের ডাল-কাটা কালিদাসের সেবায় নিয়োজিত হয় না। প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য-বৃদ্ধির ভূমিকায় যে-সাংবাদিকেরা থাকেন, তাঁদের একটা অংশ হলেন প্রতিবেদক। তাঁদের সুলিখিত প্রতিবেদন পত্রিকার প্রচার বাড়ায়, বিক্রি বাড়ায়, মালিকের ঘরে মুনাফা তুলতে সাহায্য করে। বিনিময়ে প্রতিবেদক পান স্তর অনুযায়ী বেতন, ভাতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা, বিলাসের উপকরণ, ভোগের উপাদান। সুতরাং প্রতিবেদন রচনায় মুনশিয়ানা চাই। এমন কি চলে প্রতিবেদকে প্রতিবেদকে, একই প্রতিষ্ঠানে, সুপ্ত প্রতিযোগিতা।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে তাদের ভাগ করতে পারি। অবশ্য প্রত্যেকটি পর্যায়কে আবার অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ ছাড়াও থাকে প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক প্রতিবেদন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন হয় নিম্নরূপে—

- ঘটনা, দুর্ঘটনার প্রতিবেদন
- জনকল্যাণমুখী বা জনস্বার্থবিরোধী কোন প্রকল্পের বা কাজের প্রতিবেদন
- রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি সভা-সমাবেশ-আন্দোলন-উৎসবের প্রতিবেদন
- ক্রীড়া-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-ব্যবসাবাণিজ্য-পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদন
- সম্পাদকীয় প্রতিবেদন
- বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন
- কোনো কর্মকাণ্ডের তদন্তভিত্তিক প্রতিবেদন।

প্রত্যেক সংবাদপত্রেই থাকেন বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক। সামর্থ্য, কৌতূহল, ভালোবাসার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনামাফিক সংবাদপত্রের পরিচালক বা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সাংবাদিক-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ধীরে ধীরে তৈরি করে নেন একঝাঁক বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক। একই বা সম-বিষয় কেন্দ্রিক প্রতিবেদন লিখতে লিখতে অনেকেই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েন। এই বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদকেরা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হন। এভাবেই কোনো কোনো প্রতিবেদক যেমন শিক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক হয়ে পড়েন, তেমনি কেউ কেউ হয়ে ওঠে রাজনীতি-বিষয়ে পারদর্শী প্রতিবেদক বা সংবাদদাতা। এভাবেই শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক, কৃষি-বিষয়ক, শ্রম-বিষয়ক, পশুপাল বিষয়ক,

সমাজকল্যাণ-বিষয়ক, সংস্কৃতি-বিষয়ক, ক্রীড়া-বিষয়ক, বিজ্ঞান-বিষয়ক, পরিবেশ-বিষয়ক, কর্মসংস্থান-বিষয়ক, চলচ্চিত্র-নাটক- বিষয়ক, আইন-আদালত-পুলিশ-বিষয়ক, সামরিক-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক হয়ে ওঠেন।

প্রতিবেদককে আর একটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। তাঁকে জানতে হয়, বুঝতে হয় কোন্‌টা সংবাদ, আর কোন্‌টা সংবাদ নয়। তাঁকে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে, কোন্‌ ঘটনাটা পাঠক-শ্রোতা-দর্শক খাবে, আর কোন্‌টা খাবে না। প্রতিদিনই আমাদের চারপাশে নানা ঘটনা ঘটছে, কিন্তু তার সবগুলিই সংবাদপত্রে ছাপার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব ঘটনা ডাল-ভাত-শুক্তো-চচ্চড়ির মতো সেসব নিরামিষ ঘটনা জেনে বা জানিয়ে পাঠকের যেমন লাভ হয় না, তেমনি সংবাদপত্রের। কাজে কাজেই বর্ণহীন, কৌতূহলশূন্য ঘটনা সংবাদের যোগ নয় বলেই বিবেচিত। যে-সব ঘটনা বিবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ, যা জনগণের কৌতূহল জাগায় বা নিবৃত্ত করে, যা জনজীবনে বিশেষ ভূমিকা নেয়, যা সংবাদ হিসাবে অন্তত বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে দরকারি বা আকর্ষণীয়, অথবা যে-সব ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার বিপরীত—সেগুলিই সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হয় এবং এরই রিপোর্ট বা প্রতিবেদন রচিত, প্রকাশিত হওয়া উচিত। বস্তুত-সমাজের অধিকাংশ মানুষকে আগ্রহশীল, কৌতূহলী করে তোলে যে একেবারে টাটকা তরতাজা আকর্ষণীয় বিষয়, যা ব্যতিক্রমী, অ-দৃষ্টপূর্ব তা-ই সংবাদ। এর মধ্যে থাকে আগ্রহ সৃষ্টির চিন্তা। আবার, কোনও বিশেষ ঘটনা, যা পাঠকের কাছে উপাদেয় বা জরুরি হিসাবে গণ্য হয়েছে বা হয়, তার অর্ন্ততদন্ত বা তদন্তমূলক প্রতিবেদন সেই পত্রিকার চাহিদা বাড়ায়, গৌরবও বৃদ্ধি করে।

এবার সংক্ষেপে আর একবার জানাই, প্রতিবেদন রচনার সময়ে আপনি কী কী মনে রাখবেন। কিংবা প্রতিবেদন যখন তৈরি করবেন তখন যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকবেন সেগুলো হচ্ছে—

- প্রতিবেদন হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীর শিল্পিত বিবরণ।
- তা হবে তথ্যভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ, সত্যাশ্রয়ী।
- গুজব প্রতিবেদনের ভিত্তি হতে পারে না।
- প্রতিবেদনের ভাষা হবে গতিময়, আকর্ষণীয়, বাস্তবধর্মী, সর্বজনবোধ, ব্যবহারিক অথচ শৈল্পিক।
- ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসা, অবমাননাকর উক্তি বা ইঙ্গিতদান পরিত্যাজ্য।
- একপেশে প্রতিবেদন পাঠকের কৌতূহল মিইয়ে দেয়, তাই অনভিপ্রেত।
- দেশ-জাতি-সমাজের মূল্যবোধ-ঐতিহ্যকে আঘাত দেওয়া প্রতিবেদনে অবশ্যই বর্জনীয়।
- কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার প্রতিবেদন রচনার সময়ে কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করতে পারলে ভালো হয়। উপায়-নির্দেশটি হবে বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিপূর্ণ, তথ্যনিষ্ঠ।

- ঘটনার পটভূমি প্রতিবেদনে থাকলে ভালো হয়, তবে তা হবে খুবই সংক্ষিপ্ত।
- নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশের প্রলোভন সংবরণই কাম্য।
- হেডিং বা শিরোনাম হবে সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষক, বিষয়নিষ্ঠ অথচ শিল্পশোভন।
- সাংবাদিকতার নিজস্ব নৈতিকতা কখনওই যেন লঙ্ঘিত না হয়।

১২১.৪ প্রতিবেদনের নমুনা

প্রতিবেদন বলতে আমরা কী বুঝি তা এতক্ষণে আপনার জানা হয়ে গিয়েছে। আপনি এটাও জেনে গিয়েছেন কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। এবার নিচে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদনের নিদর্শন উদ্ধৃত করছি। এই উদাহরণগুলি খুঁটিয়ে পড়ুন। তাহলে নিজে নিজেই এই ধরনের প্রতিবেদন লিখতে পারবেন।

(ক) সাহসিকতার স্বীকৃতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ২০০১-এর ২৪ অগস্ট। সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণ মিত্র প্লেসের বাড়িতে ফিরছিলেন অঞ্জনা চক্রবর্তী। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে মোটর সাইকেলে চড়ে আসা দুই যুবক অঞ্জনার গলার হার ছিনিয়ে পালাতে যায়। ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলেন তিনি। অনেকটা এ ভাবেই অকুতোভয়ে দুষ্কৃতী ধরেছেন বেলতলা রোডের গৃহকর্ত্রী দীপান্বিতা ভট্টাচার্য।

দীপান্বিতা-অঞ্জনাদের মত 'সৎ ও সাহসী' ১৪ জন শনিবার এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কলকাতা পুলিশের অনুরোধে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও কলকাতার শেরিফ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকৃতি জানালেন ১৪ জনকে। তাঁদের মধ্যে চার জন মহিলা। ২০০১-এর ৩১ অগস্ট মধ্য কলকাতার একটি দোকানের মালকিন রীতা গুপ্ত ধরে ফেলেন সশস্ত্র ডাকাতদের। এ বছর ২৫ এপ্রিল ডাকাতেরা ফ্ল্যাটে ঢুকে গৃহকর্ত্রী মঞ্জু আঞ্চালিয়ার হাত-মুখ বেঁধে দুষ্কর্ম শুরু করে। ইঙ্গিতে প্রতিবেশীদের সতর্ক করেন মঞ্জু। ডাকাতেরা ধরা পড়ে যায়। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে আছেন তিন ট্যাক্সি চালকও। তাঁদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথ পালের সততায় কয়েক হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন ফেরত পান এক যাত্রী। আর এক জন শীতল মাহাতো ট্যাক্সিতে এক যাত্রীর ফেলে যাওয়া আইন পরীক্ষার খাতা দিয়ে আসেন লালবাজারে। যাত্রীর ফেলে যাওয়া অলঙ্কার ও টাকা-সহ সুটকেস ফিরিয়ে দেন কিশোর প্রসাদ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বেকারত্বের জন্য তরুণদের মধ্যে এমনিতেই একটা বেপরোয়া মনোভাব। এর মধ্যেই সিনেমা আর টি ভি-তে বিরক্তিকর নানা ছবি দেখানো হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর মারামারি, হিংসা

সে সবে। যারা দেখছে, তাদের মধ্যে 'আমিও একটু করে দেখাই' গোছের মনোভাব তৈরি হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আলো-অন্ধকারের বিরোধের মধ্যেও মানুষ আলোর দিকেই এগোচ্ছে। আর্থ-সামাজিক কারণে পুলিশের কাজ বেড়ে গিয়েছে। আমেদাবাদে পুলিশও দাঙ্গা করেছে। কলকাতার পুলিশ কখনও দাঙ্গা করবে না। গত কয়েক বছরে এই শহরে যত খুন হয়েছে, তার ৯০ শতাংশের কিনারা করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের ধরা বা তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও পুলিশ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।"

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ালে অপরাধের দ্রুত কিনারা সম্ভবপর বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''এই কারণে পাড়া-ফুটবল চালু করা হয়েছে। এতে যথেষ্ট সুফল মিলেছে। লোকে যেন কোনও পরিস্থিতিতেই পুলিশকে শত্রু মনে না-করে।" পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্তীও তাঁর ভাষণে বলেন, ''তদন্তে সাধারণ লোকের অংশগ্রহণ ছাড়া অপরাধ-দমন করা সম্ভব নয়। এই কারণে শুরু করা হয়েছে জনসংযোগ-কর্মসূচি।" শেরিফ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''মানুষের স্বভাব পাল্টে গিয়েছে। এখন লোকে অন্যের জন্য ভাবে না। অপরাধ বেড়ে চলার এটাও একটা অন্যতম কারণ।"

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

(খ) ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট গড়বে রাজ্য, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৩রা অক্টোবর—সুন্দরবনের উন্নয়নে একযোগে কাজ করবে ইউ এন ডি পি এবং এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এ ডি বি)। সংস্থা দুটির তরফে দুটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে তার মেলবন্ধন ঘটানো হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে চেয়ারম্যান করে ইতোমধ্যেই গঠন করা হয়েছে এক কার্যকরী কমিটি। বনদপ্তর, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্যদপ্তর, সুন্দরবন উন্নয়ন সহ সংশ্লিষ্ট সবকটি বিভাগকেই আনা হয়েছে এই কমিটির মাধ্যমে একই ছাতার তলায়। আর তা করা হয়েছে ড. এম. এস. স্বামীনাথনের পরামর্শে, যিনি এই প্রকল্পটির দায়িত্বপ্রাপ্ত। বৃহস্পতিবার শিশির মঞ্চে বন্যপ্রাণ সপ্তাহের উদ্বোধন করে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিজেই।

এদিনই মহাকরণে এ ডি বি-র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এবিষয়ে এক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় একঘণ্টা ধরে চলে সেই বৈঠক। সুন্দরবনের পরিবেশ উন্নয়ন, অরণ্য এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পে গুরুত্ব পাবে সুন্দরবনবাসী অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিও। এবিষয়ে শিশির মঞ্চের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পরিষ্কার বক্তব্য, বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নতি না ঘটাতে পারলে, রক্ষা করা যাবে না অরণ্য ও বন্যপ্রাণী। আবার, উলটো দিকে প্রকৃতি ধ্বংস হলে বাঁচবে

না মানুষও। তাই রাজ্যের মানুষের স্বার্থেই রক্ষা করতে হবে রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ। অন্যদিকে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এ ডি বি-র প্রতিনিধি দল জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। এতেই তৈরি করা হবে সুন্দরবনের উপর একটি মাস্টারপ্ল্যান। তার উপর ভিত্তি করেই এ ডি বি ঋণ দেবে রাজ্য সরকারকে। নভেম্বরেই সুন্দরবনে সমীক্ষার কাজ শুরু করবে এ ডি বি। ছয় মাসের মধ্যেই তারা রিপোর্ট জমা দেবে। উল্লেখ্য, এর আগে বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনেও সমীক্ষা চালায় তারা।

প্রকৃতি এবং পরিবেশ রক্ষার্থে এছাড়াও আরও কিছু কর্মসূচী এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এরাজ্যে একটি ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে রাজ্য সরকার। খড়গপুর আই আই টি-র সহযোগিতায় গড়ে উঠবে কেন্দ্রটি। আপাতত ঠিক হয়েছে, পরিবেশ, অরণ্য এবং বন্যপ্রাণীর উপর দুটি কোর্স পড়ানো হবে সেখানে। একটি স্বল্পকালীন কোর্স ছাড়াও ব্যবস্থা থাকবে একটি অ্যাডভান্স কোর্সের। এই পরিকল্পনাটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, দেরাদুনের ফরেস্ট ইনস্টিটিউট এবং ডব্লিউ ডব্লিউ এফের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। শুধু পড়াতেই সীমাবদ্ধ না রেখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে বন সংরক্ষণ জুলজিকাল গার্ডেন, বটানিকাল গার্ডেন সহ অন্যত্র কাজ পেতে পারেন, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার।

এছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে বর্তমান আইনের সংশোধন ঘটিয়ে আনা হতে চলেছে আরও কঠোর আইন। তবে শুধু আইনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে এই কাজে বন সুরক্ষা কমিটিকে আরও শক্তিশালী করা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ বাড়াতে চাইছে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে কাজ করতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির একটি তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। এমনকি তরুণ এবং শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা যদি এই ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কাজ করতে এগিয়ে আসেন, তবে তাঁদের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাসও এদিন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বনকে ঘিরে বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের আবেগ রয়েছে। তাঁরাই বন রক্ষা করতে পারেন। সঙ্গে চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, তরুণরা একাজে এগিয়ে এলে কাঙ্খিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবই। উল্লেখ্য, কাঙ্খিত লক্ষ্য মানে, রাজ্যের ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চল সৃষ্টি। যা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট। বর্তমানে সামাজিক বনসৃজনকে ধরলে এরাজ্যে বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ২৭ শতাংশ।

এদিন শিশিরমঞ্চের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মণ। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছাড়াও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন প্রতিমন্ত্রী মহেশ্বর মুর্মু, বনদপ্তরের প্রধান সচিব মঞ্জুলা গুপ্ত, মুখ্য বনপাল সহ বিভাগীয় অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ৩রা অক্টোবর থেকে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত উদ্‌যাপিত হবে বন্যপ্রাণ সপ্তাহ। সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে শিলিগুড়িতে।

বন্যপ্রাণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এদিন সন্ধ্যায় গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনশালায় বন্যপ্রাণ বিষয়ক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় অসম সাহসিকতার জন্য বিশেষ পুরস্কারও প্রদান করেন তিনি। পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বনবিভাগের কর্মী সুব্রত পালচৌধুরী, বিজয়কুমার গায়েন এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা ফরেস্ট ডিভিসনকে।

● **গণশক্তি**

(গ) খাদ্য সংগ্রহের নামে কোটি কোটি টাকা নয়ছয়

নিজস্ব সংবাদাতা, বারাকপুর : রাজ্য সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে সাংঘাতিক অনিয়ম ধরা পড়েছে, ক্ষতি হয়েছে ১৭৭ কোটি টাকা। আর্থিক অনিয়ম, স্বজনপোষণ, নীতি বহির্ভূতভাবে চালকল মালিকদের প্রচুর টাকা পাইয়ে দেওয়া, ভুয়ো পরিবহন বিল বানিয়ে টাকা তোলা সহ একাধিক অনিয়ম ও অবৈধ কাজের অভিযোগ উঠেছে। কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে রাজ্য সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে নানা অনিয়মের অভিযোগের তীর মূলত বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধেই।

১৯৯৭ সাল থেকে রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে অংশ নিয়ে চলেছে। কিন্তু গত চার বছরে সংগ্রহ অভিযান কখনও লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি। টাকা লেনদেনে নানা অসংগতি, আর্থিক দাবি পেশ করার ক্ষেত্রে অহেতুক দেরি, চাষীদের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করা, মজুত খাদ্যশস্য নষ্ট করা, খাদ্যশস্যের মান সম্পর্কে উদাসীনতা ইত্যাদি আরও নানা কারণে কমপক্ষে ১৭৭ কোটি ৬৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে গত চার বছরে। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর থেকে ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত এই ক্ষতি হয়েছে বলে রাজ্যের খাদ্য কমিশনার এবং রাজ্য সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এন রামজিকে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল এস বি বেহেরা। খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে দেওয়া হলে, রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানের টাকায় অবৈধভাবে ভ্রমণ, কন্টিন্জেন্সি বা অফিস চালানোর খরচ, ছাপা, কাগজপত্র, কালি, বিভাগীয় বাড়ি তৈরি, গোডাউন ভাড়া ইত্যাদি কাজেও প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ করেছেন। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের জন্য ভর্তুকির টাকা ও 'ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে' জমা না দিয়ে 'শট টার্ম ডিপোজিট'-এ জমা দেওয়া হয়েছে যার ফলে আরও তিরিশ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে।

সরকারি ওই রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেছে রাজ্যের ৪২টি মিলের চালকল থেকে গোডাউন পরিবহন বাবদ ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকার বিল পাইয়ে দেওয়া হয়েছে মিল মালিকদের। সরকারি

নির্দেশ ছিল চালকল থেকে আট কিলোমিটার দূরে থাকা গোডাউনে চাল মজুত করা হলে তবেই পরিবহন ভাড়া দেওয়া হবে।

কিন্তু চালকলের মধ্যে গোডাউন অথচ পরিবহন বাবদ ওই বিপুল টাকার বিল মেটানোর প্রশ্ন উঠেছে কার স্বার্থে এবং কি উদ্দেশ্যে ওই টাকা মিল মালিকদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

● **সংবাদ প্রতিদিন**

(ঘ) হাওড়ার বাসে উদ্ধার বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব সংবাদাতা, হাওড়া, ৫ই অক্টোবর—হাওড়া স্টেশন লাগোয়া দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড থেকে শনিবার চারটি বিস্ফোরক এবং ছয়ঘড়ার একটি দেশী রিভলবার উদ্ধার করলো হাওড়া জেলা পুলিস। জেলা পুলিস সুপার রাজেশ কুমার জানান, এদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ গোলাবাড়ি থানা এলাকায় নন্দীগ্রামগামী একটি বেসরকারী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ঐ বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। বিস্ফোরকগুলি ল্যান্ড মাইন বলেই পুলিসের সন্দেহ। এই ঘটনায় ঐ বাসের চালক এবং কন্ডাক্টর ছাড়াও বাসের ২৩ জন যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিস। বিস্ফোরকের প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে সেনাবাহিনীরও।

উল্লেখ্য, রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই মেদিনীপুরগামী বাস থেকে বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র মেলায় পুলিস সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার করে।

পূজোর আগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিতই তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় মুখ্যমন্ত্রীর একটি অনুষ্ঠান থাকায়, ছিল বাড়তি সতর্কতা। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ তল্লাশি চালানোর সময় দীঘা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ বাসটি থেকে উদ্ধার করা হয় বিস্ফোরকগুলি। বাসটির নম্বর ডব্লুউ বি ১১এ ০৪৪৩। বাসের ১৩ এবং ১৪ নং সিটের বাঙ্কারে রাখা একটি ব্যাগেই রাখা ছিলো বিস্ফোরকগুলি। একটি পলিথিনের ব্যাগে খবরের কাগজে মোড়া ছিল সেগুলি। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ১৩নং সিটটি সংরক্ষিত ছিলো মনোরঞ্জন সামন্তর নামে। আর ১৪নং সিটটি সংরক্ষিত ছিলো আহমেদ মল্লিকের নামে। তবে এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারেননি দু'জনের কেউই।

গোলাবাড়ি থানার পুলিস বিস্ফোরকগুলি উদ্ধার করার পর খবর দেওয়া হয় সি আই ডি কেও। জেলা পুলিস সুপার জানান, সি আই ডি-র বিশেষজ্ঞরা বিস্ফোরকগুলি ল্যান্ডমাইন বলে সন্দেহ করছেন।

কে বা কারা এই বিস্ফোরকগুলি রাখলো, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। কোথায় তা পাচার করা হচ্ছিলো তাও জানার চেষ্টা চলছে।

এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার নানা অস্ত্রশস্ত্র ও বেআইনী সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে হাওড়ার ঐ বাসস্ট্যান্ড থেকে। গত সরস্বতী পুজোর দিন সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় প্রচুর পরিমাণ গাঁজা। মাস ছয়েক আগেও একটি বাস থেকে উদ্ধার করা হয় দুটি রিভলবার। আর বছর কয়েক আগে দীঘা বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিলো যাতে ছিল ৪টি রিভলবার। বাসস্ট্যান্ডের শ্রমিক-কর্মচারীরাই সেবার তা উদ্ধার করে তুলে দিয়েছিলেন জেলার তৎকালীন পুলিস সুপার সুরজিৎ পুরকায়স্থর হাতে।

● **গণশক্তি**

(ঙ) এ ডি বি-র নিকাশী উন্নয়ন প্রকল্পে এজেন্সিকেই দিতে হচ্ছে ৮ কোটি ৬ লাখ

নিজস্ব সংবাদাতা, হাওড়া, ৫ই অক্টোবর—এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় কলকাতা পুরসভার সংযুক্ত এলাকার নিকাশী ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। ১৭শো কোটি টাকার এই বিশাল কর্মযজ্ঞের দেখভাল করা, রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং সাধারণ মানুষকে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য কলকাতা পুরসভা একটি জনসংযোগ সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। নাম প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং অ্যাণ্ড মার্কেটিং লিমিটেড। এই জন্যে ওই সংস্থাকে পুরসভা দেবে ৮ কোটি ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ২১৯ টাকা। ১৯ সেপ্টেম্বরের মেয়র-পার্ষদ বৈঠকে বিষয়টি অনুমোদিত হয়। ৫ অক্টোবরের মাসিক অধিবেশনে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পুরসভার মাসিক অধিবেশনে ফেলা হলে বিরোধী দলনেতা নির্মল মুখার্জি জানতে চান এ ব্যাপারে অর্থাৎ এজেন্সিকে নেওয়ার সুপারিশকারী কন্ট্রাক্ট নেগোশিয়েশন কমিটিতে কারা আছেন? ৮ কোটি ৬ লাখ টাকা এজেন্সিকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা!

জবাবে মেয়র জানান, তিনি নিজে পুর কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তারা আছে। তারাই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সম্যান অ্যাডভাটাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং লিমিটেডের নাম প্রস্তাব করে অন্য প্রশ্নের উত্তরে মেয়র জানান, ওই এজেন্সিকে যে ৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা দিতে হচ্ছে তা এ ডি বি-র শর্ত মেনেই।

এ ডি বি-র শর্ত হল দেয় ৩৭০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৫ শতাংশ অ্যাডভাটাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং এজেন্সিকে দিতে হবে।

আগের বামবোর্ডের আমলে ঠিক হয়েছিল, কলকাতা পুরসভার সংযুক্ত এলাকাগুলোর নিকাশী ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। সেই কাজ ঢেলে সাজাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, যা পুরসভা বা রাজ্য সরকারের পক্ষে বহন করা মুসকিল।

তখন ঠিক হয় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কাজটা করা হবে ৪১টি ওয়ার্ডে। সেইমত উদ্যোগ শুরু হয়। এর মাঝে পুরসভা বামপন্থীদের হাত থেকে চলে যায় তৃণমূল-বি জে পি'র হাতে। এবার সেই ঋণ পাচ্ছে পুরসভা। কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট প্রোজেক্ট।

সংক্ষেপে কে ই আই পি। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের এই ধরনের এজেন্সি মাঝখানে থাকলে অনেক বাড়তি ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবে পুরসভা।

● **কালান্তর**

(চ) স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হবে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এই উদ্যোগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিটি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিকে একটি স্বয়সম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে গড়ে তোলা। এই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা শেষ হয়েছে। গত শনিবার এস এস কে এম হাসপাতালে এই বিষয়ে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল রিসার্চের ডিরেক্টরের সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষণ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারদের বৈঠক হয়। স্বাস্থ্য অধিকর্তা (শিক্ষা) চিত্তরঞ্জন মাইতি জানিয়েছেন, ওই বৈঠকের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে স্বাস্থ্য দফতর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প থেকে এই খাতে টাকা পাওয়া যাবে।

ইমার্জেন্সির উন্নয়নের জন্য শিক্ষণ হাসপাতালগুলিতে ঠিক কী ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন, শনিবারের বৈঠকে বিভিন্ন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানতে চাওয়া হয়। ইমার্জেন্সির আধুনিকীকরণের জন্য আনুমানিক খরচের একটি হিসাবও চাওয়া হয় হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের কাছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমার্জেন্সি চালু করতে গেলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

চিত্তরঞ্জনবাবু জানান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র মনে করেন, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির ইমার্জেন্সি বিভাগের পরিষেবা আদৌ যথাযথ ও আধুনিক নয়। সেই কারণেই মন্ত্রী ইমার্জেন্সির আধুনিকীকরণে বিশেষ আগ্রহী। চিত্তরঞ্জনবাবুর কথায়, ‘‘আগে রিপোর্ট খতিয়ে দেখি। কী কী পরিকাঠামোগত পরিবর্তন এবং সংযোজন প্রয়োজন, সব বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’’

চিত্তরঞ্জনবাবু বলেন, প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, যে-সব হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ১০০০ বা তার বেশি, সেখানে ইমার্জেন্সির জন্য ১০০ শয্যা, এবং যে-সব হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা ৭৫০-এর মতো, সেখানে ইমার্জেন্সির জন্য ৫০টি শয্যা রাখা হবে। এই ব্যবস্থা প্রথমে চালু করা হবে শিক্ষণ হাসপাতালগুলিতে। সাফল্য পাওয়া গেলে জেলা ও মহকুমা স্তরের হাসপাতালেও এই ব্যবস্থা চালু করা হতে পারে। ইমার্জেন্সির আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া যাবে বলে আশা করছে স্বাস্থ্য দফতর। চিত্তরঞ্জনবাবু জানান, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য যে-প্রকল্পে বিশ্বব্যাঙ্ক রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে, তাতে অত্যাধুনিক চিকিৎসা-সরঞ্জাম কেনার বরাদ্দ থেকেই এই অর্থ পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, ‘‘সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো রয়েছে। আমাদের মূলত দরকার কিছু নতুন যন্ত্রপাতি। সেটা বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় হয়ে যাবে।’’

নতুন চেহারার ইমার্জেন্সিতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তো থাকবেই। থাকবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দল। ইমার্জেন্সির জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট সংখ্যক শয্যাও রাখা হবে। ইমার্জেন্সির বহির্বিভাগে আসা যে-সব রোগীকে চিকিৎসার জন্য সাময়িকভাবে হাসপাতালে রাখা প্রয়োজন বলে ডাক্তারেরা মনে করবেন, তাঁদের ওই শয্যায় ভর্তি করে নেওয়া হবে। মোট ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত রোগীদের সেখানে রাখা হবে। তার বেশি সময় হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ওই রোগীকে নিয়মমাফিক ভর্তি হতে হবে।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

(ছ) মরসুমের প্রথম ট্রফি ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল—২ ইন্ডিয়ান অয়েল—০

আলভিটো, চন্দন (পেনাল্টি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ৫ই অক্টোবর—কলকাতার বাইরে দীর্ঘদিনের খেতাব খরা কাটিয়ে উঠলো ইস্টবেঙ্গল। নওগাঁতে ইন্ডিপেনডেন্স কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হলো তারা। খেতাব জয়ের মরসুমের প্রথম ট্রফিও ঘরে তুললো। শনিবার ফাইনাল ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারিয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েলকে। ধূলিয়াজানের এই দলটি গ্রুপ ম্যাচে হারিয়েছিলো ইস্টবেঙ্গলকে। আসল ম্যাচে জিতেই মধুর প্রতিশোধ নিলেন লাল-হলুদ জার্সিধারীরা। এদিন নওগাঁর নুরুল আমিন স্টেডিয়ামে প্রায় পনেরো হাজার দর্শক হয়েছিলো। সকলেই সমর্থন করেছিলো স্থানীয় দলটিকে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ফুটবলাররা আক্রমণে ওঠবার সময় সারা মাঠ চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছিলো। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের দুই অর্ধে দুটি গোল করে খেতাব পেয়ে গেলো। নওগাঁর এই টুর্নামেন্টটি

জিতে খুশি দলের ফুটবলাররা। অনেকে এও বললেন, ‘‘তাহলে প্রমাণ হলো আমরাও গঙ্গার ওপারে গিয়ে ট্রপি জিততে পারি।’’

ইস্টবেঙ্গল শুরু থেকে আক্রমণাত্মক নির্ভর ফুটবল খেললেও, গোল পেতে তাদের বেশ অপেক্ষা করতে হয়েছে। কেন না ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোলটা পায় বিরতির মিনিট তিনেক আগে। কৌস্তভ ঘোষ ইনসাইড ডজে প্রতিপক্ষের দুই ফুটবলারকে পরাস্ত করে পাস দেন আলভিটোকে। ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে পাঠান এই গোয়ানিজ। ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় তথা শেষ গোলটি পায় এর ঠিক তেইশ মিনিট বাদেই। দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে চন্দন দাস পেনাল্টি থেকে গোল করেন। ওভারল্যাপ করে সূর্যবিকাশ চক্রবর্তী প্রতিপক্ষ বক্সে ঢুকলে বাধা দেন এক ডিফেন্ডার। রেফারি মৃণাংশু ভট্টাচার্য পেনাল্টির বাঁশি বাজান। এক পাশে গোলরক্ষককে রেখে চন্দন শটে বলে জালে পাঠিয়েছেন। খেলার পরেই ফুটবলারদের অভিনন্দিত করে কোচ সুভাষ ভৌমিক গুয়াহাটি চলে যান। তবে যাওয়ার আগে ছেলেদের বলেছেন কলকাতায় ফিরে উপহার দেবেন। ম্যানেজার দীপ্তেন বসু অবশ্য নওগাঁর হোটেল থেকে টেলিফোনে বললেন, এতো চাপ সত্ত্বেও ছেলেরা ভালো ম্যাচ খেলেছে। এরজন্য কোচকেও প্রশংসা দিতে হবে।

ওকোরো কার্ড সমস্যার জন্য খেলতে পারেননি। সুযোগ পেয়ে কৌস্তভ খারাপ খেলেননি। তাঁর পরিবর্তে ত্রিজিৎ নামেন। যদিও প্রত্যেকটি ম্যাচে ভালো ফুটবল খেলার জন্য রক্ষণের ব্রাজিলীয় ডগলাসকে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট বাছা হয়েছে। কোচ অবশ্য সূর্যর খেলার প্রশংসা করেছেন। এদিন নওগাঁর মাঠে ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গল কোচ গুয়াহাটিতে চলে যান ম্যাচের শেষে। কাল দুপুরে ফুটবলারদের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরবেন সুভাষ ভৌমিক।

ইস্টবেঙ্গল—অর্পণ, সূর্যবিকাশ, শুভাশিস, সুরেশ, ডগলাস, ষষ্ঠী, দীপঙ্কর (চন্দন), অনীত, কুলোথুঙ্গন, কৌস্তভ (ত্রিজিৎ), ও আলভিটো।

● **গণশক্তি**

(জ) রোগীদের ব্যাপারে আরও মানবিক আচরণ করার জন্য চিকিৎসকদের বললেন বুদ্ধদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রোগী ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি আরও একটু মানবিক হওয়ার জন্য চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিবেকের কাছে আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালগুলিতে অনেক অসুবিধা রয়েছে, অনেক চাপ নিতে হয়। তবে দুটি বিষয়ে আমরা জোর দিতে চাইছি। একটি প্রশাসনিক শৃঙ্খলা আর অন্যটি হল রোগী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে একটু মানবিক

ব্যবহার। এটা শুধু সার্কুলার দিয়ে করা যায় না। তাই আপনাদের বিবেকের কাছেই আবেদন করছি। আপনারা অনেক কঠিন কাজ করছেন। যদি রোগীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাহলে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্রও বলেন, সাধারণ মানুষ অনেক উদ্বেগ ও আশঙ্কা নিয়েই হাসপাতালে আসে। কাজেই তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উচিত। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আবেদন, হাসপাতালগুলিতে নানান অসুবিধা-অভাবের মধ্যে যেসব চিকিৎসক ও কর্মী কাজ করছেন, আপনারা তাঁদের মানসিক অবস্থাও বিবেচনা করুন।

ওই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রত্যূষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা পুরসভার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, হাসপাতালের সুপার তথা উৎসবের সাংস্কৃতিক কমিটির সভাপতি ডাঃ সমীরকুমার সেনগুপ্ত, কমিটির সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তিন মন্ত্রী এবং মেয়র তাঁদের ভাষণে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই হাসপাতালের ভূমিকার প্রশংসা করেন। পরে হাসপাতালে এন্ডোস্কোপিক সার্জারির একটি নতুন বিভাগ, ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারিরও উদ্বোধন হয় এদিন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা অবশ্যই থাকা দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো ডাক্তার, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা কাজে এলেও ঠিকমতো কাজ করছেন না। এতে মানুষের মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। কারণ এটা রাইটার্স নয়। এখানে মানুষের জীবন-মৃত্যুর বিষয়টি জড়িত। তাই হাসপাতালের সুপারের নেতৃত্বে অন্যান্যেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের উপকরণ কিংবা মানবসম্পদ থাকলেও অভাব রয়েছে প্রশাসন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার। আর, চিকিৎসার সঙ্গে মানবিক ব্যবহারের বিষয়টি ভীষণভাবে যুক্ত।

এ ব্যাপারে তিনি নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, চোখের চিকিৎসার জন্য আমি কিউবায় গিয়েছিলাম। ওঁরা জানালেন, সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না। তিন দিন পরে বিভাগীয় প্রধান আমাকে ডেকে বললেন, আপনি আমাদের পরিবারের সদস্য হবেন? মনে একটু শঙ্কা নিয়েই সম্মতি দিলে ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে আপনি সিগারেটটা ছেড়ে দিন। এটা তিনি সরাসরি বলতেই পারতেন। কিন্তু সেটাই তিনি বললেন একটু অন্যভাবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্বীকার করেন, শহরের হাসপাতালের প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। তিনি বলেন, তাই চিকিৎসা ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ এগিয়ে আসায় আমরা আনন্দিত। কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলির উন্নতিও করতে হবে। কারণ শহরের ৭০ শতাংশ এবং গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষের চিকিৎসাই হয় সরকারি হাসপাতালে। আর, অসুখ করলেই গ্রামাঞ্চলের মানুষকে যাতে শহরে ছুটে আসতে না হয় সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দুই মন্ত্রী এদিন একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানান। তাঁরা জানান, উত্তরবঙ্গ, বাঁকুড়া আর বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, কার্ডিওলজি বিভাগ খোলার চেষ্টা চলছে। সিটি স্ক্যানের মতো সরকারি হারে ডায়ালিসিসের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে যুক্ত করা যায় কিনা, তাও ভাবা হচ্ছে। এছাড়া ঠিক হয়েছে সব ধরনের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা, শয্যার সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা, কতজনের এক্স-রে হচ্ছে বা অপারেশন হচ্ছে, তা নথিবদ্ধ করে বিজ্ঞানসম্মত পরিচালন ব্যবস্থা চালু করা হবে। সূর্যবাবু আরও জানান, হাসপাতালের সুপার ও মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে কিছু বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে পে-ক্লিনিক বা অন্যান্য আয়ের কিছুটা খরচ করার স্বাধীনতা দেওয়ার কথাও বিবেচনাধীন রয়েছে।

মেয়র বলেন, কয়েকটি বিভাগের জন্য এস এস কে এম হাসপাতালে না গিয়ে রোগীরা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালেই আসেন। তবে এখানে শয্যা সংখ্যার চেয়ে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বর্জ্য পদার্থ নষ্ট করার জন্য এই হাসপাতাল যে নিজস্ব উদ্যোগ নিয়েছে, তার প্রশংসা করে মেয়র জানান, কলকাতা শহরেও এক বছরের মধ্যে সেই ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, এজন্য ওই হাসপাতালে একটি প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে।

● **বর্তমান**

(ঝ) নবম শ্রেণিতে বিতর্কিত ইতিহাস পড়ানো শুরু

আজকালের প্রতিবেদন : দিল্লি, ৮ অক্টোবর—ভারতের ইতিহাসে নেই গান্ধীহত্যার মত মর্মান্তিক ও জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেন বাদ? সম্পাদকদের ব্যাখ্যা, ওই ঘটনা নিছক তথ্য মাত্র। গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনচর্চায় যার প্রাসঙ্গিকতা নেই। এভাবেই চেপে যাওয়া হয়েছে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আদি-ঘাতক নাথুরাম গডসের নাম। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং, সংক্ষেপে এন সি ই আর টি অনুমোদিত নবম শ্রেণির ইতিহাসের বইয়ে বি জে পি জোট সরকারের নেতৃত্বে গেরুয়াকরণের এটি একটি নমুনা। ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হবে, ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর বি জে পি দুর্ভাগ্যবশত সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারেনি। ১৩ দিনের সরকারের পতনকে 'দুর্ভাগ্য' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং সেই ঘটনা গান্ধীহত্যার চেয়ে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন ইতিহাস বইটির লেখক ও সম্পাদকরা। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে গঠিত সরকারের যে আদপেই গরিষ্ঠতা ছিল না, সে কথা বলা হয়নি। গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মহিমান্বিত করা হয়েছে। নবম শ্রেণির পাঠ্য এই বইয়ের নাম 'সমকালীন ভারত'। লেখক ও সম্পাদকরা যে অন্ধ কমিউনিজম বিরোধিতা থেকে বইটি প্রণয়ন করেছেন, তার দুটি নমুনা দেওয়া

যেতে পারে। লেখা হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের কোনও ভূমিকা ছিল না। এ দেশের কমিউনিস্ট ও জিন্নার অনুগামীরা স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করেনি। দেশের স্বার্থ রক্ষা না করে তারা মুসলিম লিগকে সমর্থন করেছে। ব্রিটিশকে মদত দিয়েছে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবকে আলোচ্য বইয়ে বলা হয়েছে 'লেনিনের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান'। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা নস্যাৎ করতেই 'অভ্যুত্থান' আখ্যা দেওয়া হল। এভাবেই প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির জন্যও অনুরূপ একটি বই প্রণীত হয়েছে। সেখানেও আছে তথ্যের বিকৃতি। দ্বিতীয় বইটির নাম 'ভারত ও বিশ্ব'। এন সি ই আর টি-র ডিরেক্টরের তরফে 'প্রকৃত ইতিহাস লেখা ও ব্যাখ্যা'-র সাফাইও দেওয়া হয়েছে।

● আজকাল

(ঞ) স্বদেশী ঃ মুখর হলেন যোশীও

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : বি জে পি-র শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি সংঘ পরিবার প্রকাশ্যে অনাস্থা প্রকাশ করার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলীমনোহর যোশী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে কামান দাগলেন। বি জে পি-র বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় ডঃ যোশি বলেন, "শিক্ষায় যেমন সংস্কার করে ভারতীয় ঐতিহ্যের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তেমনি আর্থিক নীতির ভিত্তি স্বদেশীয়ানা করতে হবে। নইলে দেশের বিপদ।" আর্থিক নীতি নিয়ে এই প্রথম ডঃ যোশী প্রকাশ্যে মুখ খোলার কারণ, সংঘ পরিবারের মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'র সম্পাদকীয়তে প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা।

এবার আক্রমণের তীর উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানির দিকেই। আদবানির পাকিস্তান সংক্রান্ত মন্তব্যগুলিকে রীতিমতো ব্যঙ্গ করা হয়েছে সম্পাদকীয়তে।

● সংবাদ প্রতিদিন

(ট) বুভুক্ষা, বৈষম্যের সমাধানে নামুক বিজ্ঞান ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৪ঠা অক্টোবর—আর কোনো হিরোশিমা নয়, মানবতার অগ্রগতিতেই হোক বিজ্ঞানচর্চা। নিছক বিজ্ঞানচর্চার জন্যই বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান সমাধান করুক অনাহার, বুভুক্ষা আর স্বাস্থ্য সমস্যার। আর বিজ্ঞানের হাত ধরেই কমুক উত্তর-গোলার্ধ আর দক্ষিণ-গোলার্ধের অর্থনৈতিক বৈষম্য। শুক্রবার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

এদিন বিধাননগরে ভ্যারিয়েল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারে মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সংস্থার অধিকর্তা অধ্যাপক বিকাশ সিন্‌হা জানান, এই মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিশেষত ক্যান্সার এবং হৃদরোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। প্রকল্পটি গড়ে তোলার জন্য ৫.২ একর জমিও দিয়েছে রাজ্য সরকার। কসবার কাছে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে দেওয়া হয়েছে ওই জমি। সংস্থার অধিকর্তা আরো জানান, প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ৫৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩২ কোটি টাকা ব্যয় হবে যন্ত্রপাতির জন্য। তিনি আরো জানান, ভারত সরকার মারফৎ বেলজিয়ামের কাছ থেকে সফট্‌ লোন হিসাবে পাওয়া গেছে ওই টাকা।

এদিন এছাড়াও সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে একটি হিলিয়াম পরিশোধন প্ল্যান্টেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর এবং ঝাড়খণ্ডের তাঁতলই-এর উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়, তা থেকেই হিলিয়াম গ্যাস নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করছে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার। ক্রায়ো কনডেনসেশন প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করে এনরিচমেন্ট প্লান্টে আনা হয় উষ্ণ প্রস্রবণের গ্যাস। পরে ক্রায়ো অ্যাডসর্পশন প্রক্রিয়ায় সংশোধন করা হয় হিলিয়াম গাসকে। যা পরে ব্যবহার করা হয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহাকাশ কর্মসূচী, ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিৎ (এম আর আই) এবং সুপার কনডাকটিং ম্যাগনেট টেকনোলজিতে।

এদিন ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারে সাইক্লোট্রন মেশিনটি ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাহা ইনস্টিটিউটে উদ্বোধন করেন সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা। ১৯৫০ সালে জন্মলগ্ন থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়কালে সংস্থার উল্লেখযোগ্য গবেষণাগুলির তথ্য সংকলিত রয়েছে এই স্মরণিকায়। রাজ্যে পারমাণবিক শক্তি কী কী ভাবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে এদিন সংস্থার অধিকর্তা অধ্যাপক বিকাশ সিন্‌হার পরামর্শও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

● **গণশক্তি**

(ঠ) দশম যোজনায় ৮% উন্নয়ন

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর—দশম যোজনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির লক্ষ্য ৮ শতাংশে বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। দশম যোজনার খসড়া পত্র আজ পূর্ণ যোজনা কমিশনের বৈঠকে পেশ করা হয়। খসড়া অনুযায়ী ৮ শতাংশ বৃদ্ধির হারই অনুমোদিত হয়। দেশের অর্থনীতিতে এই পরিবর্তন করার জন্য, এত বৃদ্ধির হারকে ৫.৫. শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী মূলত পাঁচ দফা দাওয়াই-এর প্রস্তাবও দিয়েছেন। এই পাঁচ দফা সূত্রে রয়েছে—বিলগ্নীকরণ, শ্রম সংস্কার, কর সংস্কার, কৃষিজ পণ্যের বিক্রির উপরে বাধা নিষেধ প্রত্যাহার এবং

সরকারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনা। বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে দেশীয় বিনিয়োগের সঙ্গে তিনি বিদেশি বিনিয়োগের উপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সঙ্ঘ পরিবার থেকে শুরু করে দলের 'সংশয়বাদীদের' প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে আশ্বস্তও করেছেন, ''বিদেশি বিনিয়োগের ফলে দেশীয় শিল্প বা জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু করা হবে না। এই নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই।''

বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ করা হবে কিনা, বা সেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব কি না, তা নিয়ে এর আগেই নানা সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কী পরিমাণ এবং কী ধরনের বিনিয়োগ করলে এই লক্ষ্য পূরণ করা যায়, সেই পরিমাণ বিনিয়োগ সম্ভব কী না ইত্যাদি নিয়েও দ্বিমত ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কমিশনের পূর্ণ বৈঠকে জানিয়ে দেন, লক্ষ্য মাত্রা ৮ শতাংশই রাখা হবে। তাঁর চার পাতার বক্তব্যের অধিকাংশ জুড়েই রয়েছে, কেন তিনি এই পথ নিচ্ছেন তার ব্যাখ্যা।

এই লক্ষ্য পূরণ করতে গেলে যে-কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। নতুন প্রথায় ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, দেশীয় লগ্নি থেকে যতটা সম্ভব উৎপাদন বাড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ধারণা, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ৮ শতাংশ করতে গেলে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, তার সবটাই দেশী বিনিয়োগ থেকে সম্ভব নয়। সেই কারণেই ঘাটতি পূরণে বিদেশী লগ্নির প্রয়োজন রয়েছে। তবে এরই সঙ্গে যাঁরা এই নিয়ে শঙ্কিত বা সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদেরও তিনি আশ্বস্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ''দেশের শিল্পের স্বার্থহানি করে বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হবে না।''

শ্রম সংস্কারের কাজটি যে তিনি আগামী মার্চের মধ্যেই চূড়ান্ত করে ফেলতে চান, এই কথা তিনি সদ্য সমাপ্ত শ্রম সম্মেলনে জানিয়েই দিয়েছিলেন। আজ সেই কথারই কার্যত পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, লক্ষ্য পূরণে শ্রম সংস্কার অতি আবশ্যিক। এবং তা করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর ধারণা, গত কয়েক বছর জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার একটা বড় কারণ পরিকাঠামোগত বাধা।

তাঁর মতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন অত্যন্ত জরুরি। আজকের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সংস্কার না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই ক্ষেত্রেও দ্রুত সংস্কার দেশকে সার্বিক বিকাশের দিকে এগিয়ে দেবে।

জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার প্রয়োজন, এমন ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক

ক্ষেত্রেরও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার প্রয়োজন। তাঁর বক্ত, বেসরকারি উদ্যোগ টানতে গেলে এই সার্বিক প্রশাসনিক সংস্কার খুবই জরুরি। তিনি বলেন, সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে আরও বেশি সমঝোতা ও সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই বৈঠকে তিন খণ্ডের খসড়াটি পেশ করা হয়। জাতীয় বৃদ্ধির হার নির্দিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যওয়াড়ি বৃদ্ধির হারও দশম যোজনায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যোজনা রিপোর্টে রাজ্যওয়াড়ি বৃদ্ধির হার এ বারই প্রথম নির্দিষ্ট করা হল। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র পন্থের বক্তব্য, রাজ্যগুলির সঙ্গে বিশদ আলোচনার ভিত্তিতেই এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। তিন খন্ডের যোজনা রিপোর্টে এ বারই প্রথম রাজ্যগুলির পরিকল্পনা এবং তার কৌশল নিয়েও একটি আলাদা খন্ড তৈরি হয়েছে।

২০০২-২০০৭, এই পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় দারিদ্রের হার ২৬ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির হয়েছে। সাক্ষরতার হার ৭৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে। সমস্ত গ্রামে পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিকল্পনায় চারটি বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যোজনাপত্রে। এগুলি হল—

- পরিকাঠামো এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কার্যক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে জোর দিতে হবে।
- নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ তৈরির কথাটি মাথায় রাখতে হবে।
- সরকারের কার্যক্ষমতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর দিতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর বক্তব্যে এই দিকগুলি ছুঁয়ে গিয়েছেন।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

(ড) ফুটপাথে শিশুর মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার : শনিবার সকালে পার্ক সার্কাসের কাছে একটি মৃত শিশু পড়ে থাকতে দেখা যায়। চার নম্বর সেতুর পশ্চিম দিকের ঢালে ফুটপাথের উপরে এই দিন ভোরে শিশুটির দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় মানুষ পুলিশকে খবর দেন। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বেলা সওয়া ৯টা নাগাদ পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মৃত শিশুটিকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই শিশুটির হাতে একটি টিকিটে লেখা ছিল এক ডাক্তারের নাম। ওই সূত্র পেয়ে পুলিশ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যায়। সেখানে খোঁজ নিয়ে পুলিশ জানতে পারে ওই শিশুটির মা মুমতাজ শেখ ওই হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছেন। শিশুটির বাবার নাম আজাদ। বাড়ি তিলজলা থানা এলাকার গুলাম, জিলানি খান রোডে। শুক্রবার রাতে মুমতাজ মৃত শিশুটি প্রসব করেন। মাতৃগর্ভেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

(ঢ) বেহাল রাস্তা, মার খাবে শঙ্করপুরের পর্যটন শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : সামনেই স্টার্ট দেওয়া কোয়ালিস গাড়িটা দাঁড়িয়ে। যাত্রীরা বসে আছেন। কলকাতা থেকে আসা গাড়ির মালিক কাম চালক শুকলালসাহেব রাস্তায় নেমে একটা লাঠি দিয়ে জলের গভীরতা পরীক্ষা করছেন। পর পরই ওই রকম গর্ত। রাস্তা যেন জলাভূমি। বৃষ্টির জলে গর্তগুলি ছোটখাট ডোবার আকার নিয়েছে।

চৌদ্দ মাইল মোড় থেকে শঙ্করপুর যাওয়ার প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তার ছবি এইরকম। ছোট গাড়ি ভেঙে যেতে পারে। বড় গাড়ির মধ্যে সরকারি বাস আর স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে পারছে না। আর রাস্তার এই অবস্থার পাশাপাশি দিবারাত শঙ্করপুর জুড়ে লোডশেডিং।

বেহাল রাস্তা এবং বিদ্যুতের জন্য শঙ্করপুরে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। বস্তুত এবার দুর্গাপুজোর ছুটিতে পর্যটকরা মনোরম এই সমুদ্রসৈকতে ভিড় জমাবেন কিনা তা নিয়ে ঘোর সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা। বেসরকারি হোটেল এবং সরকারি অতিথি নিবাসগুলিতে এবার এখনও পর্যন্ত পর্যটকদের বুকিং একেবারেই আশানুরূপ নয়। শঙ্করপুর অঞ্চলের মূল মালিক মৎস্যদপ্তর। দপ্তরের মন্ত্রী কিরণময় নন্দ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাস্তার দায়িত্ব তাঁর দপ্তরের নয়। আর মৎস্য দপ্তরের যা বাজেট তাতে এই রাস্তা মেরামতির সাধ্য তাঁর নেই। তবে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি নাবার্ডের টাকায় রাস্তা করে দেবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে মন্ত্রী জানান।

ঘটা করে বছর দেড়েক আগে শঙ্করপুরে ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন পর্যটন মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়। তারপর একটা ইঁটও গাঁথা হয়নি। অথচ, শঙ্করপুরকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে ঠাঁই দেওয়ার চেষ্টায় রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রায়ই লম্বাচওড়া কথা বলে। বিজ্ঞাপনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পর্যটকদের শঙ্করপুরে টানার প্রয়াস চালায় রাজ্য সরকার।

কিন্তু পর্যটক শিল্পকে গড়ে তুলতে হলে যে ন্যূনতম পরিকাঠামো দরকার তা শঙ্করপুরে নেই। মৎস্যদপ্তর তিনটি দারুণ অতিথি নিবাস তৈরি করেছে। মৎস্যগন্ধার পর কিনারা এবং জোয়ার, তিনটি জায়গাই বেশ নিরিবিলি। ব্যবস্থাও ভাল। তিনটে বেসরকারি হোটেল আছে শঙ্করপুরে। আরও চারটি হোটেল তৈরি হচ্ছে। দীঘার ঘিঞ্জি এলাকা এবং ভিড় ছেড়ে, অনেক পর্যটকই এখন শঙ্করপুরকে বেশি পছন্দ করছেন। ঝাউ বন এবং সমুদ্রের আকর্ষণে প্রতি বছর দুর্গাপুজো থেকে পর্যটকদের ভিড় শুরু হয় শঙ্করপুরে।

কাঁথি থেকে দীঘা যাওয়ার রাস্তা এখন এত ভাল যে, চৌদ্দমাইল মোড় পর্যন্ত যেতে আধঘন্টার বেশি লাগে না। এই ২৭ কিলোমিটার রাস্তার পর মোড় ঘুরে ঢুকতে হবে শঙ্করপুর। ৭ কিলোমিটার রাস্তা যেতে লাগবে আধঘন্টার বেশি। সবচেয়ে বড় কথা, শৌখীন গাড়ি নিয়ে পর্যটকরা এই রাস্তায় ঢুকতেই চাইবেন না।

আর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যস্ত। ২৪ ঘন্টা টানা লোডশেডিংও এখন শঙ্করপুর এলাকার মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। বিদ্যুতের অভাবে শুধুমাত্র পর্যটন নয়, মার খাচ্ছে মাছের ব্যবসাও। শঙ্করপুরে রয়েছে মৎস্যবন্দর। প্রচুর মাছ ওঠে। ইলিশ, চিংড়ির মতো দামি মাছ মজুত করতে গেলে, প্রচুর বরফ লাগে। কিন্তু বরফ তৈরির কারাখানাগুলি বিদ্যুতের অভাবে ধুঁকছে। চাহিদা অনুযায়ী বরফ সরবরাহ করতে পারছে না তারা।

● বর্তমান

(ণ) ডায়েরিয়া নিয়ন্ত্রণে পানীয় জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হল বারাসতে

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত পুরসভার ২৬, ২৭ এবং ২৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং মধ্যমগ্রাম পুরসভার কিছু এলাকায় দূষিত পানীয় জল খেয়ে প্রায় পাঁচশো মানুষ ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তবে বেসরকারি মতে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি। এদের মধ্যে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পানীয় জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি ১০টি টিউবয়েল বসানো হচ্ছে এবং যে ডিপ টিউবয়েলের জল খেয়ে এত মানুষ ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে তা এখনিই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আর যে সমস্ত পাইপ পুরনো হয়ে গেছে সেগুলো পালটে ফেলা হবে। মঙ্গলবার মহাকরণে পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এই খবর দিয়ে বলেন, সমস্ত পরিস্থিতির ওপর প্রশাসন নজর রাখছে। আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়েছি। তারা আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পরীক্ষা করা হবে।

পুরমন্ত্রী আরও বলেন, কে এম ডি এ-র অফিসাররা আক্রান্ত এলাকায় যাবে এবং স্থানীয় মানুষদের বোঝাবে কিভাবে পানীয় জল ব্যবহার করলে মানুষ সুস্থ থাকে এবং তারা আক্রান্ত এলাকায় হ্যালোজেন ট্যাবলেট বিতরণ করবে।

কে এম ডি এ-র অফিসাররা খোঁজ নেবে পানীয় জলের উৎসের সঙ্গে কি কোনভাবে ড্রেনের দূষিত জল মিশেছে কি না। মিশলে কোথায় এবং কিভাবে মিশেছে তারা পরীক্ষা করবে।

অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনার ডি এম এইচ দ্বিবেদী এদিন জানান, এখন পর্যন্ত ৫০০ জন ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৪ জনকে বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১৩ জনকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে এবং একজন কলকাতার আই ডি হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন।

ডি এম জানান, গতকাল দূষিত জল খেয়ে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধা মারা গেছেন। ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হ্যালোজেন এবং আর এস প্যাকেট পাঠানো হয়েছে যাতে নতুন করে আর কেউ না দূষিত জল খেয়ে ডায়রিয়ার আক্রান্ত হয়।

অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচিব এদিন বলেন, স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনের কয়েকজন ডাক্তারকে বারাসাতের আক্রান্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছে। তারা দুর্গত এলাকায় মানুষদের পরীক্ষা করবেন এবং জলের নমুনা নিয়ে ক্রমে দু-একদিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন। দুর্গত এলাকায় মেডিকেল ক্যাম্প বসানো হয়েছে। স্থানীয় পুরসভা তার দেখভাল করছে।

প্রসঙ্গত স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী প্রত্যুষ মুখার্জি উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক এবং ঘটনাবলির পর্যালোচনা করেন।

● **কালান্তর**

(ত) বর্ধমানে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব, বাজে হত ২

আজকালের প্রতিবেদন : পুজোর মুখে দুর্যোগ। মঙ্গলবার দুপুরের পর ঝড়, তুমুল বৃষ্টি। কলকাতায় উৎসবের মেজাজে ভাঁটা পড়ল। বর্ধমানের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে প্রবল ঘূর্ণিঝড়। বাজ পড়ে মারা গেছেন ২ জন। প্রচুর কাঁচা বাড়ি আর গাছ ভেঙে পড়েছে। বহুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্ধমান শহর ছিল অন্ধকার। ঝড়ের তাণ্ডবে সেখানে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৮ জন। সবথেকে খারাপ খবর হল—আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ আর ঘূর্ণাবত। তার জন্যই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে এই দুর্যোগ। সকলেরই চিন্তা, পুজোর কদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে। নিম্নচাপ আর ঘূর্ণাবর্ত আরও সক্রিয় হবে না তো! উৎসবের আনন্দ ঝড়-বৃষ্টিতে থমকে যাবে না তো! আলিপুর

আবহাওয়া অফিস অবশ্য জানাচ্ছে, নিম্নচাপের রেখাটি এখন পর্যন্ত দুর্বল। এখনই বড় ধরনের দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে সামনের দিনগুলিতে আচমকা অবনতি কিছু ঘটবে কি না এখনই বলা যাচ্ছে না। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সারাদিন ভ্যাপসা গরমের পর আকাশে কালো মেঘের ছোটাছুটি চলতে থাকে। বইতে থাকে ঠান্ডা হাওয়া। তারপর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে নামে মুষলধারে বৃষ্টি। বর্ধমানের অবস্থা সবথেকে খারাপ হয়। সেখানে দুর্যোগ শুরু হয় দুপুর সাড়ে এগারটা থেকে। প্রথমে মৃদু ঝড়, তারপর তার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের আকার এত মারাত্মক হয়ে ওঠে যে একসময়ে অনেকেই মনে করেন, টর্নেডো নয় তো! বাজ পড়ে মারা যান নেতিয়া গ্রামের ছনাবড়া দুলে (২০) এবং রায়ন গ্রামের মালকিতায় বধু মালিক (২২)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজবাটীতে উপড়ে যায় পুরনো গাছ। ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ আর টেলিফোনের থাম। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে যায়। শহরের বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুজো মণ্ডপগুলিও। বর্ধমান সদর থানা জানিয়েছে, এই তীব্র ঘূর্ণিঝড় মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বড় বাজার এবং বেড়িয়ান এলাকায়। গাছ আর কাঁচা বাড়ি ভেঙে আটজন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে দুর্গাপুর, আসানসোলেও। এদিকে কলকাতার আকাশের হঠাৎ ভোল বদল দেখে সকলেই অবাক হন। শরতের নীল আকাশের আলো উধাও হয়ে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। যাঁরা শেষ মুহূর্তের পূজোর বাজারে বেরিয়েছিলেন তাঁরা বিপাকে পড়েন। যাঁরা প্রতিমা আনতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা বের করেন পলিথিন। একসময়ে নামে প্রবল বৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। পুজোর সময়েও এই দুর্যোগ থাকবে নাকি! আবহাওয়াবিদরা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, এতটা শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। আবহাওয়ার এই অবনতি সাময়িক। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা জানালেন, গত কয়েকদিন ধরে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি নিম্নচাপ রেখা ছিলই। এই সঙ্গে বিহার ও সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এটি ভূপৃষ্ঠের এক থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগলবন্দির প্রভাবেই আবহাওয়ার অবনতি। তবে তিনি জানান, নিম্নচাপ রেখাটি বেশ দুর্বল। বায়ুমণ্ডলে এখনও যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকাতেই এই বৃষ্টি। এর ফলে আজ বুধবারও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর জন্য বড় ধরনের দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না বলে তিনি জানান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে মেদিনীপুরেও। বৃষ্টি হয়েছে খড়গপুর, নারায়ণগড়, দাঁতন, এগরা, ঘাটাল, ঝাড়গ্রামসহ সর্বত্র।

● **কালান্তর**

(থ) দিঘা, দার্জিলিঙে পলিব্যাগ প্রতিরোধে কড়া নজরদারি

স্টাফ রিপোর্টার : পুজোয় সুন্দরবন, রাজ্যের পার্বত্য এলাকা, বনাঞ্চল বা দিঘায় পলিব্যাগ (২০ মাইক্রনের কম বা বেশি) ব্যবহারের উপরে জোরদার নজরদারির ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। ওই সব এলাকায় পলিব্যাগ ব্যবহারে আগেই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। পুজোয় ভ্রমণার্থীরা যাতে যততত্র পলিব্যাগ ফেলে দূষণ সৃষ্টি না-করেন, সেই জন্যই কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পরিবেশ মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়।

ওজোন দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মানববাবু জানান, বেশ কিছু দিন ধরেই পর্ষদ রাজ্যে পলিব্যাগ নির্মাতা ও মজুতাকারী সংস্থাগুলিকে কড়া নজরে রাখছে। বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে বেশ কিছু সংস্থা বন্ধও করে দেওয়া হয়েছে। এই বার সাধারণ মানুষের মধ্যে পলিব্যাগ থেকে সৃষ্ট দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে রাজ্য সরকার বেশ কিছু ট্যুরিস্ট স্পটে ভ্রমণার্থীদের উপরেও কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করছে। কারণ, বহু ভ্রমণর্থীরা ওই সব জায়গায় পলিব্যাগ ফেলে নোংরা করে আসেন। মন্ত্রীর কথায়, ‘‘আমরা চাই, মানুষ পলিব্যাগের দূষণ সম্পর্কে সচেতন হোন। কাউকে হেনস্থা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষ যদি নিজে থেকেই পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করে দেন, তা হলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।” তবে ঠিক কবে থেকে কড়াকড়ি হবে, তা বলতে চাননি মন্ত্রী।

পর্ষদের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত ৮ অগস্ট এবং ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা, সল্টলেক, বেহালা, হাওড়া, চুঁচুড়া, বর্ধমান, ব্যারাকপুর, বারাসত, আসানসোল ও দিঘার সমুদ্রতীরে হানা দিয়ে বেশ কিছু পলিব্যাগ নির্মাতা, মজুত ও ব্যবহারকারী সংস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০ মাইক্রনের চেয়ে কম ঘনত্বের পলিব্যাগ ব্যবহার করায় চুঁচুড়ায় বন্ধ করা হয়েছে একটি জুতো প্রস্তুতকারী সংস্থার শো-রুমও।

এ দিকে, একটু যত্ন করলে আর নজর রাখলে কলকাতার মতো বেশি ঘনবসতিপূর্ণ শহরের পরিবেশ-মানচিত্রেরও উন্নতি হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন কনসাল জেনারেল জর্জ এন সিবলি। সোমবার আমেরিকান সেন্টারে ‘ইউনাইটেড স্টেটস এশিয়া এনভায়রনমেন্টাল পার্টনারশিপ’ এবং ‘সিটি ডেভেলপার্স ফোরাম’-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পরিবেশ সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সিবলির কথার সূত্র ধরেই ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দুই মার্কিন বিশেষজ্ঞ কাথ উইলিয়ামস এবং ডোনা ম্যাকিনটায়ার ‘গ্রিন বিল্ডিং’ বা পরিবেশ-বন্ধু বাড়ি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের মতে, শহরের দূষণ-মানচিত্র পরিবর্তন করতে গেলে নতুন বাড়ি নির্মাণে বিশেষ কিছু নীতি মেনে চলা দরকার। এই

নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে জলের পরিকল্পিত ব্যবহার এবং পুনর্ব্যাবহার, সূর্যালোক ও বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, বর্জ্য থেকে ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি। কে এম ডি এ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসার প্রভ দাসও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

(দ) জবাব দেবেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ

পশ্চিমবঙ্গ সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে। বামফ্রন্ট-বিরোধীদের এই অভিযোগ নূতন নয়। কয়েকটি সংবাদপত্র তো প্রতিদিন অঙ্ক কষছে। উদ্দেশ্য একটাই, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে পশ্চিমবঙ্গ ছিল স্বর্গরাজ্য। ছিল না আর্থিক মন্দা। শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের কোনও সমস্যা ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা ছিল সুরক্ষিত। এইরকম সব কিছুই। কিন্তু বামফ্রন্ট গত ২৫ বছরে সব শেষ করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন সর্বনাশের শাসন চলছে। এটা প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি সংবাদপত্র, কয়েকজন সাংবাদিক খুবই ব্যস্ত। বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিও কম যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার যে সব দিক থেকেই ব্যর্থ এটা জানান দেবার জন্য কত ব্যবস্থা-আয়োজন। আমরা সমালোচনার বিরুদ্ধে নই। ভুল-ভ্রান্তি-ব্যর্থতার কথা উঠুক, মানুষ মুখ খুলুক—এতে আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা আর একটা ছবি দেখতে চাই। সে ছবিটা উন্নয়নের। প্রশ্নটা যদি এভাবে রাখি : গত ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ কি সত্যি সত্যি পিছিয়ে গেছে? উন্নয়নের কোনও উদাহরণ নেই? সব রাজ্য অগ্রগতির আলোয় ঝলমল করছে, অন্ধকার শুধু পশ্চিমবঙ্গে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন সাধারণ মানুষ। তাঁরাই সব হিসেব-নিকেশ মিলিয়ে নেবেন ব্যর্থতা ও সাফল্যের দাঁড়িপাল্লায়। একটি বিশেষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার এবার অর্ধেক 'বোনাস/অনুদান' দিচ্ছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে সবাই খুশি নয়। কারণটা সঙ্গত না অসঙ্গত—সে বিতর্কে না গিয়ে একটা কথা অসঙ্কোচেই বলা যায় : গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, মিজোরাম, কাশ্মীর ও সিকিমে বোনাস নেই। বোনাস/অনুদান ছিল, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে রাজস্থান, মণিপুর, আসাম, বিহারে। মেঘালয়ে বড়দিনে মাত্র ২৫০ টাকা এবং কালীপূজায় ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এবার পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি। কেন্দ্রীয় সরকারই এখন তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। এই সঙ্কটের থাবায় পড়েছে দেশের ২৮টি রাজ্য। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ এই ২৮টি রাজ্যের মধ্যে একটি। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার প্রভাবে সব রাজ্যই বিব্রত। পুজোর মাসের পুরো বেতন এবং অর্ধেক বোনাস পাওয়া গেল। কিন্তু সামনের মাসের বেতন সরকার দিতে পারবে কি? এই প্রশ্নটা কেন সুকৌশলে সামনে নিয়ে এসেছে বামফ্রন্ট

বিরোধীরা? উদ্দেশ্য একটাই, তা হলো আতঙ্ক সৃষ্টি করা। বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আগামী মাসের বেতন সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু সমালোচকদের ঘুম নেই। তারা সরকারকে 'দেউলে' বলতেও দ্বিধা করছে না। তা ওঁরা বলুন। সমালোচনার ঝড় তুলুন। কিন্তু সমস্যা কি শুধু পশ্চিমবঙ্গের? যেখানে, দেশের একাধিক রাজ্য মাসের পর মাস বেতন যোগান দিতে পারছে না, সরকারী পরিষেবা লাটে উঠেছে—সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সব সঙ্কট মোকাবিলা করে, সাধ্যমতো সব পরিষেবা বহাল রাখছে। সমালোচকরা ভুল করেও এ কথাটা উচ্চারণ করছেন না। বলছেন না এ কথাও, বি জে পি-জোট সরকার ঋণে ঋণে জর্জরিত। ঋণের সুদ গুনতেই সরকারের কোষাগার শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবছে মহার্ঘভাতা বন্ধ করার কথা, অবসরের বয়স কমানোর কথা। আর পেনশন? তাও অনিশ্চিত!

● **গণশক্তি**

(ধ) পথে প্রবাসের সেই পর্যটক অন্নদাশঙ্করের পথ চলা শেষ

স্টাফ রিপোর্টার : বিদায় নিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুখে বেশ কিছু দিন ধরে ভুগছিলেন তিনি। গত ৮ অগস্ট তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল এস এস কে এম হাসপাতালে। চার দিন আগে শ্বাসনালিতে সংক্রমণ ঘটায় তাঁকে ইনটেনসিভ ট্রিটমেণ্ট ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার বিকেল ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি।

জীবনের প্রথম ভাগ কাটিয়েছেন ওড়িশার ঢেঙ্কানলে। পিতা নিমাইচরণ রায়, মা হেমনলিনী দেবী। ১৯২১ সালে ঢেঙ্কানল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বি এ পাশ করেন ১৯২৫-এ। ১৯২৭ সালে আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম হন। পরবর্তী কালে পড়াশুনা করেন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স এবং লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিস-এ। কর্মজীবনের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ছিলেন। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের জুডিশিয়াল সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। ১৯৩০ সালে মার্কিন কন্যা অ্যালিস ভার্জিনিয়া অনডোর্ফকে বিবাহ করে নতুন নাম দেন লীলা রায়।

কোন ভাষায় গড়বেন সাহিত্যজীবন? বাংলা না ওড়িয়া? জীবনের একটা সময়ে বস্তুত এ রকমই একটা দ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছিল অন্নদাশঙ্করকে। দু'টো ভাষাই জলের মতো বইত তাঁর কলমে। ১৯২৭ সাল থেকে প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী 'পথে প্রবাসে' দিয়ে বাংলা সাহিত্যের মাটিতে তাঁর পা জমানো। তার পর? অন্নদাশঙ্কর রায় মানে কারোও কাছে 'তেলের শিশি ভাঙল বলে'র মতো 'আপ্তবাক্য' লেখা

ছড়াকার। কারও কাছে 'পথে প্রবাসে'র অসাধারণ পর্যটক। কারও কাছে মানবতাবাদী, ধর্ম নিরপেক্ষ এক চরিত্র। কারও কাছে 'ঋজুরেখ প্রবন্ধ আর লঘুভার ছড়ার মধ্য দিয়ে প্রগাঢ় মানববাদের দিশারী।' তবে তাঁর সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য মত—অন্নদাশঙ্কর রায় মানেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তিবাদী অবস্থান। এবং বার্ধক্যের আক্রমণে কেঁপে যাওয়া জীবনের শেষ দিনগুলির মধ্যেও লিখে যাওয়ার অক্লান্ত ইচ্ছে।

৮ অগস্ট এস এস কে এমে ভর্তি হওয়ার পরেও বারো লাইনের একটা ছড়া লিখেছেন—'ঐরাবত'। লিখতে শুরু করেছিলেন চার পাতার—ছেলেবেলার স্মৃতি। আশির দশকে নৈতিকতা, অহিংসা আর সামাজিক সাম্য নিয়ে নিজের সোজাসাপ্টা ভাষায় লিখেছিলেন উপন্যাস—'ক্রান্তদর্শী'। লেখার পরে খুঁতখুঁত। যা বলতে চেয়েছিলেন, বলা হয়নি। তাই তিন বছর আগে লিখতে শুরু করেন 'পুনর্নবীকরণ।' চল্লিশ পাতা পর্যন্ত এগিয়েছিল। ছায়াসঙ্গী সুরজিৎ দাশগুপ্তকে ভার দিয়ে গিয়েছেন সমাপ্ত করতে। উৎসর্গ করতে বলে গিয়েছেন তসলিমা নাসরিনকে।

এই তসলিমা নাসরিনকে নিয়েই যখন বাংলাদেশে মৌলাবাদীদের গলা সপ্তমে উঠেছে তখনও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে। তসলিমাকে বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনায় তাঁর ভূমিকা জানেন অনেকেই। মৌলবাদ এবং বাদীদের বিরোধী ছিলেন আজীবন। তাই '৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে সভ্যতাবিরোধী বলতে দ্বিধায় পড়েননি। অন্নদাশঙ্করের লেখা 'অনুপ্রবেশ' পড়ে ক্ষেপে উঠেছিল হিন্দু মৌলবাদীরা।

মানুষটিকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন তাঁদের দাবি, সহজ অথচ দৃঢ় যে সমাজচেতনায় অন্নদাশঙ্করের বিশ্বাস ছিল, সে পথে ভবিষ্যতে হাঁটার লোক খুব কম। কবি শঙ্খ ঘোষের কথায়, ''সমাজজীবনের যে কোনও সঙ্কটের সময়ে পথ নির্দেশ চাওয়ার জন্য একটা সময় সকলের মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের নাম। গত প্রায় ৪০ বছর ধরে সে রকম সঙ্কট মুহূর্তে আমরা তাকিয়ে থেকেছি অন্নদাশঙ্কর রায়ের দিকে। তিনি আর রইলেন না। তাঁর অভাব এখন সকলেই আমরা বোধ করব।" কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, ''অন্নদাশঙ্কর ছিলেন দুই বাংলার মাথার ওপর অদ্বিতীয় অভিভাবক। তাঁকে হারিয়ে আমরা অসহায় বোধ করছি। ভাষা ও সাহিত্যের সীমানারও বাইরে তাঁর ভাবনা অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাক।"

এ দিন তাঁর মৃত্যু সংবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আক্ষেপ, ''বিজয়ার পরেও আমায় চিঠি লিখেছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ধন্যবাদ দিতে। লিখেছিলেন আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছি।"

● আনন্দবাজার পত্রিকা

১২১.৫ সারাংশ

সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটে যেমন সংবাদপত্র-বেতার-দূরদর্শন-নিউজ এজেন্সি ইত্যাদিতে তেমনি সাংবাদিকের রচনাটিতে ধরা পড়ে বিভিন্ন সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র। বিষয় ও লক্ষ্যসাধনের সম্মিলনে ঠিক হয়ে যায় সাংবাদিক কোন্ সংরূপটি গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ কী, কীসের জন্য ও কীভাবে—এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর থেকে নির্বাচিত করে নিতে হয় জেন্‌রটি। নিউজ-আইটেম, আর্টিক্‌ল্‌, কমেন্ট্রি, রিপোর্ট, রিপোর্টাজ, অবিচুঅরি, ইন্টারভ্যু, পোর্ট্রেট, ডিসকাশন, রেভ্যু, গ্লস, টেলপিস, কলাম ইত্যাদি প্রত্যেকটি সংরূপের চেহারা আলাদা, রচনারীতি স্বতন্ত্র, মেজাজ ও মর্জি ভিন্ন।

তাছাড়াও রয়েছে হেডলাইন বা শিরোনাম দেবার নানা পদ্ধতি। শিরোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১২১.৬ অনুশীলনী

ক. ছোট প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ নম্বর। একটি মাত্র বাক্যে উত্তর দিতে হবে।]

১। প্রতিবেদন পরিভাষাটি কোন্ ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ?

২। Report শব্দটির মূল লাতিন শব্দটি কী?

৩। প্রতিবেদন শব্দটি কীভাবে রবীন্দ্রনাথ বাক্যে ব্যবহার করেছেন তার একটি উদাহরণ দিন।

৪। Report-কে বাংলায় কী বলে?

৫। প্রতিবেদক শব্দের অর্থ কী?

৬। মানুষের প্রধান ও সর্বপ্রথম চাহিদা কী?

খ. মাঝারি প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫ নম্বর। পাঁচ-ছ'টি বাক্যে উত্তর দিতে হবে।]

১। একজন ভালো প্রতিবেদকের মধ্যে কী কী বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়?—পাঁচ-ছ'টি বাক্যে লিখুন।

২। প্রতিবেদকের কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করে পাঁচটি বাক্য লিখুন।

৩। প্রতিবেদনে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তা পাঁচটি বাক্যে উল্লেখ করুন।

৪। জুলিয়াস ফুসিকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে রিপোর্টাজ ও রিপোর্টের পার্থক্য চার-পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৫। প্রতিবেদন রচনার সময়ে প্রতিবেদককে মনে মনে কোন্ কোন্ প্রশ্ন ও তার উত্তর কল্পনা করে নিতে হয়?

গ. বড় প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ নম্বর। উত্তর দিতে হবে দশ-বারোটি বাক্যের মধ্যে।]

১। প্রতিবেদন লিখতে বসে প্রতিবেদককে কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় তা দশ-বারোটি বাক্যে উল্লেখ করুন।

২। নিম্নলিখিত শিরোনাম ব্যবহার করে দশ-বারোটি বাক্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী প্রতিবেদন রচনা করুন—

- বেশি রোগীর চাপে হাসপাতালে শিশুমৃত্যু
- পেনশন পেতে শিক্ষকদের হয়রানি
- আন্ত্রিক ছড়াচ্ছে কলকাতায়
- পকেটমার ধৃত
- দুটি বাসে মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত দশ
- পুলিশের সততা

১২১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। Franz Faber : *Methodic of Journalistic Work.*

২। R. K. Chatterjee : *Mass Communication.*

৩। Mohit Moitra : *A History of Indian Journalism.*

৪। Harold Frayaman, David Griffiths & Chris Chippindale : *Into Print.*

৫। Yuri Kashlev : *The Mass Media and International Relations.*